প্রকাশনার ৫৩ বছর

চিকিৎসা সাময়িকী

মার্চ-২০২৬



সুস্থ হার্ট, কিন্তু রোগ লুকিয়ে রয়েছে ছোটখাটো ইঙ্গিতেই! ৯টি লক্ষণ দেখে সতর্ক হতে হবে

মোবাইলহীনতায় অস্থিরতা! আপনি কি নোমোফোবিয়ায় ভুগছেন?





কেন একসঙ্গে একাধিক সন্তান গর্ভে আসে?

মস্তিষ্কের মানচিত্রে নারী-পুরুষ

পিসিওএস ও সচেতনতা

ইবনে সিনা কার্ডিয়াক সেন্টার

ফুলটাইম কনসালটেন্ট | ২৪ ঘন্টা কার্ডিয়াক সেবা | তুলনামূলক কমখরচ

কার্ডিয়াক আউটডোর ও ইনডোর সেবা

- ২৪ ঘন্টা কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সি
- সিসিইউ
- কার্ডিয়াক আইসিইউ
- পোস্ট অপারেটিভ কার্ডিয়াক সেবা
- হাইপারটেনশন ও হার্ট ফেইলিউর চিকিৎসা
- কার্ডিয়াক ডায়াগনোস্টিক সেবা

কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন

- এনজিওগ্রাম
- এনজিওপ্লাস্টি (হার্টে রিং স্থাপন)
- পেসমেকার স্থাপন
- বেলুন ভালভুলোপ্লাস্টি
- এএসডি, ভিএসডি ডিভাইস
- আইসিডি, সিআরটি/ডিভাইস ইমপ্লান্টেশন

কার্ডিয়াক সার্জারি

- বিটিং হার্ট বাইপাস সার্জারি
- ওপেন হার্ট সার্জারি
- ভাল্‌ভ প্রতিস্থাপন
- ভাসকুলার সার্জারি

শিশু কার্ডিয়াক সার্জারি

- হার্টের জন্মগত ত্রুটিসহ শিশুদের সব ধরনের কার্ডিয়াক সার্জারি

IBN SINA

ইবনে সিনা হাসপাতাল

বাড়ি নং-৬৮, রোড নং-১৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা। ফোন: ৫৫০২৯১০১-৯, মোবাইল: ০১৮২৩-০৩৯৮০০, হট লাইন: ০১৭৭১-২৪১৬৭৩

মাসিক

চিকিৎসা সাময়িকী

মার্চ-২০২৬

বর্ষ ঃ ৫৩ ॥ ৮ম সংখ্যা

সম্পাদক
ডাঃ মির্জা মহিবুল হাছান

নির্বাহী সম্পাদক
ডাঃ আয়েশা সিদ্দিকা

সহযোগী সম্পাদক
মির্জা মেহেদী হাছান

আইন বিষয়ক সম্পাদক
এ্যাডঃ মোস্তাইন বিল্লাহ
ভিপি কৌশুলী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

ইভেন্ট ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ রিফাত হোসেন

বর্ণ বিন্যাস ও মুদ্রণ
চিশতিয়া প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

সার্কুলেশন ম্যানেজার
ফরিদুল আলম কাজল (০১৭২৩-৫২৮৯৪১)

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৩৩/১ পুরানা পল্টন (৩য় তলা)
ঢাকা- ১০০০
০১৯১২-৫৪১৮৫২
০১৮৪২-৫৪১৮৫২

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র



আমার কথা

বাংলাদেশে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ ৬৭ হাজার মানুষ নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং মারা যাচ্ছেন ১ লাখ ১৬ হাজারের বেশি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে অগ্রগতি প্রশংসনীয় হলেও এই রোগ জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির জন্য এক বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সবচেয়ে বড় ঘাটতি হলো প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ, পর্যাপ্ত জনবল ও আধুনিক চিকিৎসা অবকাঠামো। দেশে রেডিওথেরাপি মেশিনের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অপ্রতুল, দক্ষ চিকিৎসক ও নার্সের ঘাটতি রয়েছে, আর ওষুধের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, দেশব্যাপী স্ক্রিনিং সেন্টার স্থাপন, ওষুধের ভ্যাট ও শুল্ক কমানো এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এখন সময়ের দাবি। ক্যানসার চিকিৎসায় মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ বা টিউমার বোর্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্জারি, কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপির সমন্বয় ছাড়া সঠিক ফলাফল পাওয়া কঠিন। একইসঙ্গে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ এবং গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। ওষুধ কোম্পানিগুলোর লভ্যাংশের একটি অংশ গবেষণায় ব্যবহার করলে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন আসবে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো আর্থিক সুরক্ষা। ব্যয়বহুল চিকিৎসার কারণে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের উচিত ক্যানসার রোগীদের জন্য বিশেষ ইন্স্যুরেন্স বা 'ক্যানসার ফান্ড' গঠন করা। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা-লয়ের সহায়তা বৃদ্ধি এবং ওষুধের মূল্য সাধারণের নাগালে রাখা গেলে বহু প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হবে। ক্যানসারকে হারানো সম্ভব, যদি আমরা সময়মতো সচেতন হই এবং সম্মিলিতভাবে লড়াই করি। নীতিনির্ধ-ারক, চিকিৎসক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ওষুধ শিল্প- সবার সমন্বিত প্রচেষ্টাই পারে বাংলাদেশকে ক্যানসারের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে। আজ যারা ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছেন এবং যারা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাদের সাহসের প্রতি সম্মান জানিয়েই আমাদের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

মতামত পাঠক/পাঠিকাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের একটি নিয়মিত বিভাগ। তাদের পাঠানো মতামত একান্তই তাদের। এ মতামতে আমাদের অভিমতের প্রতিফলন ঘটেনি, আর তাই আমরা এ মতামতের জন্যে দায়ী নই।

আমি একটি সুন্দর বাংলাদেশ চাই

আমি চাই না, মন্ত্রী মিনিষ্টার দেশের চিন্তা করে না। আমি চাই, মন্ত্রী মিনিষ্টার দেশের সেবা করে। আমি চাই না, নেতা দেশকে ধ্বংস করে। আমি চাই, নেতা দেশের জন্য জীবন দিতে পারে। আমি চাই না, চেয়ারম্যান নিজের স্বার্থ দেখে। আমি চাই, চেয়ারম্যান নিজের এলাকা সুন্দর করে। আমি চাই না, ডাক্তার গরীবদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। আমি চাই, ডাক্তার গরীবদের জন্য এগিয়ে আসে। আমি চাই না, ভন্ড বাক্তি (আমি চাই, একজন সমাজ সেবক। আমি চাই না দেশদ্রোহী। আমি চাই একজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান, ওসমাণ, সালাম, বরকত, জব্বার আমি চাই না, বেঈমান পুলিশ। আমি চাই একজন ঈমানদার পুলিশ। আমি চাই না, সন্ত্রাস। আমি চাই, একজন বিপ্লবী সৈনিক। আমি চাই না, জনগন দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। আমি চাই, জনগন দেশের সম্মান রক্ষা করে। আমি চাই না, হরতাল। আমি চাই, দেশের শান্তি। আমি চাই না, খুন-রাহাজানি। আমি চাই, সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকা। আমি চাই না অহংকার, হিংসা বিদ্বেষ। আমি চাই, একতা। আমি চাই না, ধর্ষিতা, এসিড দগ্ধ হউক নারী। আমি চাই, ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকুক নারী। আসুন আমরা সবাই মিলেমিশে গড়ে তুলি সুন্দর একটি দেশ। যেখানে থাকবেনা, অন্যায় অত্যাচার জুলুম, সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানী, ধর্ষণ, বলৎকার, এসিডদগ্ধ, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারি, কাটাকাটি, অহংকার, হিংসা-প্রতিহিংসা, হরতাল বা মিছিল, ভাংচুর ইত্যাদি। আর চাই না গৃহ যুদ্ধ। চাই সুন্দর একটি দেশ। আমরা বাঙ্গালী ভাইয়েরা সবাই একত্রিত হব। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবো। সবাই সবাইকে সুখের দাওয়াত দিব। একজন আরেকজনকে কুশলাদি জিজ্ঞেস করব। বিপদ-আপদে এগিয়ে আসব্যে। তবেই না হবে আমাদের সুন্দর সোনার বাংলাদেশ।

আবদুল্লাহ আজাদ।
রমনা/ঢাকা

ছাত্ররাজনীতিঃ প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বড়ই বিচিত্ত। এদেশের রাজনৈতীক পটভূমি দীর্ঘ, বিস্তৃর্ণ ও আকর্ষণীয়। আর এসব রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ছাত্রদের ভূমিকা সব সময় অগ্রণী। ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গন আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, সর্বোপরি ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা আজও দেশবাসী শ্রদ্ধাচিত্তে স্বরণ করে। সালাম, জব্বার, রফিক, জেহাদ ডাঃ মিলনসহ অসংখ্য ছাত্র নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে গেছেন অন্যায় অবিচার, জেলে জুলুম আর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে। আর এসব আন্দোলন শুরু হতো মিনি পার্লামেন্ট বা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে। কালের বিবর্তনে ছাত্ররাজনীতি আজ নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। রাজনৈতীক ছত্রছায়ায় ছাত্ররাজনীতি বন্দী হয়ে পড়েছে। যার ফলে আপামর জনসাধারন ছাত্রদের উপর আগের সেই আস্থা রাখতে পারছে না। কেননা, ছাত্র নামধারী কিছু অছাত্র, সন্ত্রাসী আর পেশাদার বা কিছু খুনী ছাত্ররাজনীতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। খুব স্বাভাবিক কারণে এরা কলমের পরিবর্তে হাতে অস্ত্র তুলে নিচ্ছে, চর দখলেরমতো দখল করছে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, হল এবং হোস্টেলসমূহ, শিল্পপতি, ঠিকাদার ব্যবসায়ী অপহরন করে দাবী করছে মুক্তিপন, রাজনৈতিক সভা সমাবেশের নাম দিয়ে চাঁদা আদায় করছে লক্ষ লক্ষ টাকা আর ছিনতাই করছে টেন্ডার এমন কি তারা আজ ব্যাংক ডাকাতি, হাইজ্যাক রাহাজানি, চুরি করতে ও পিছলা হচ্ছে না। আর এসব অপকর্মের অগ্রসেনানী হিসেবে আছে কিছু পেশাধারী তথাকথিত রাজনীতিবিদ। যারা নিজের স্বার্থের জন্যে কোমলমতি ছাত্রদের হাতে কালো টাকাও অবৈধ অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারনে আজকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার কথা উঠেছে। দেশের বুদ্ধিজীবী, কলামিষ্ট, লেখক, সাংবাদিকেরা পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে সোচ্চার। একজন ছাত্র হিসেবে বলতে চাই, শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন আজকে সারা বাংলাদেশই সন্ত্রাসের বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত। সেদিন একটি জাতীয় দৈনিকে ঢাকা নগরীতে খুনের নগরী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর জন্য কি ছাত্ররাজনীতি দোষী? ছাত্ররাজনীতি যদি বন্ধ করা হয় তাহলেই কি সন্ত্রাসের মরণ ছোবল হতে দেশকে বাঁচাতে পারবো আমরা

আখলাক হোসেন/ চট্টগাম

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল কারিদের ফাঁসি দিন

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে পরিমিতভাবে শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ-মাংস খেতে পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। কিন্তু বাজারে এ দ্রবগুলো আদৌ স্বাস্থ্যসম্মত কিনা, কিংবা বিষাক্ত হয়ে রয়েছে কিনা এটা বোঝা সাধারন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে ঢাকা জেলার 'ভেজাল বিরোধী অভিযান' পরিচালনাকারী 'ম্যাজিস্ট্রেট' এর ভাষ্যে সাধারণ মানুষ রীতিমতো আতঙ্কিত। তাদের মতে-বিদেশ থেকে আমদানি করা ইনট্যাক্ট ফলের মধ্যে ৫০-৬০ শতাংশ ফরমালিনযুক্ত। ফরমালিন ব্যবহার করা হয় মরা জীবজন্তুর লাশকে বছরের পর বছর ধরে তাজা রাখতে। কিন্তু আমরা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে সেই বিষাক্ত ফরমালিনই খাচ্ছি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, বাজারে অসময়ে কিংবা যথাসময়েও যতো রকমের ফল পাওয়া যাচ্ছে এখন, তার শতভাগই ভেজাল তথা ফরমালিনে ভরপুর। অসাধু ব্যবসায়ীরা ফলমূল শাক-সবজি এবং মাছ-মাংস বেশি সময় ধরে তাজা রাখতে অত্যন্ত গোপনে মিশিয়ে দিচ্ছে এ ফরমালিন। যা খেয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার পরিবর্তে, রোগাক্রান্ত হবার ঝুঁকিই বেড়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে- 'ফরমালিন মেশানো ফলসমূহসহ খাদ্যদ্রব্য গ্রহনের কারণে ফুসফুসের

কার্যক্ষমতা নষ্ট, অ্যাজমা, লিভার ক্যান্সার বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম, মাথাব্যথা ও চোখ জ্বালাপোড়া করতে পারে এবং ফরমালিনযুক্ত মাছ পাকস্থলী, ফুসফুস ও শ্বাসনালীতে ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। বাজারে আপেল, আঙ্গুর, কমলা, মালটা, আমসহ যাবতীয় ফল, টমোটো, বেগুন, আলুসহ যাবতীয় সবজি, মাছ ও মাংস এবং দুধ বিক্রেতারা একটা সময়ে 'পচে নষ্ট হবার আশঙ্কায়' দাম কম হলেও কাষ্টমারের হাতে তুলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। আর এখন আকাশ ছোঁয়া একটা দাম হাঁকিয়ে ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে বসে থাকে বিক্রেতারা। কোন শক্তির ওপর ভর দিয়ে তারা এমন ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখায়? কাষ্টমার কিনলে কিনুক, না কিনলে পরে বিক্রি করা যাবে আরো বেশি দামে-এমন মানসিক শক্তি পায় কোথায় তারা? উত্তর বোধকরি সেই ফরমালিন। দেশের বাজারগুলোতে সরকারিভাবে ভেজাল চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা থাকলে সাধারন মানুষই ভেজালকারিদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতো। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আমরা ফরমালিনের চরম ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবগত থাকলেও অজ্ঞাতে এই বিষ যে গ্রহন করছি না এ কথা নিশ্চিত থাকতে পারবো কীভাবে? সরকারের ভেজালবিরোধী অভিযানতো আর প্রতিদিন প্রতিবাজারে চালানো হয় না। আর যখনই অভিযানে কেউ অপরাধী সাব্যস্ত হলো, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিয়ে মোবাইল কোর্ট মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানা করেই দফারফা করে ফেলছে। এতে করে অপরাধীদের মাঝে টাকা দিয়ে মুক্ত হবার সুযোগে অপরাধপ্রবণতা আরো বেড়ে যায়। ভেজাল থেকে গ্রাহকদের বাঁচাতে, সরকার প্রতিটি বাজারে একটি করে ভেজাল চিহ্নিতকরণ মেশিন সরবরাহ করতে পারে অথবা উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতিটি বাজারে ভেজালবিরোধী অভিযান পরিচালনা করুক এবং ভেজালের মাধ্যমে যারা মানুষের জীবন নিয়ে জুয়া খেলে তাদের নিছক জরিমানাই নয়, বরং আর্থিক হুমকির মুখে ফেলে দেয়ার অপরাধে সর্বোচ্চ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই প্রদান করুক। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া এবং ভেজাল খাদ্য বিক্রির সর্বোচ্চ শাস্তি 'মৃত্যুদণ্ড' জনস্বার্থে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ভেজালকারি নরপশুদের সর্বোচ্চ শাস্তির মুখোমুখিই করাতে হবে, নইলে অপরাধীরা অপরাধ করবে এবং টাকা দিয়ে পার পেয়ে যাবার সুযোগে দেশ ও জাতির চরম সর্বনাশই করে যাবে কেবল।

সামসুল আরেফিন/ ঢাকা

পরিবহনে প্রতারণা

আমি একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। আমি ঢাকা থেকে গাজীপুর জেলার ভবানীপুর যাওয়ার উদ্দেশে শাহবাগ মোড় থেকে ধারা করে বিকাল প্রায় পৌনে পাঁচটায় গাজীপুর চৌরাস্তায় পৌছি। মাওনা-ভালুকাগামী বাসে ওঠার আগে বাসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা যুবক বয়সী কন্ডাক্টরকে গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে ভবানীপুর ভাড়া কত লাগবে জিজ্ঞেস করলে সে ১২ টাকা ভাড়া বলে জানায়। ভাড়ার বিষয়টি যাচাই করার কারণ হল, এ লাইনে কোন সময়ে গাড়ি কম চলাচল করলে বাসের কন্ডাক্টর বা ভাড়া আদায়কারী কখনও কখনও ১৫-২০ টাকা এমনকি ৩০ টাকা ভাড়াও দাবি করে থাকেন। যথারীতি বাসে আরোহন করি এবং ওই কন্ডাক্টর ভাড়া চাইলে ১০ টাকার নোট আছে, তবে ভাংতি ২ টাকা নেই বললে সে ২ টাকা দিতেই হবে মর্মে জানায়। তখন তাকে ১০ টাকার নোটসহ আরেকটি ৫ টাকার নোট দিলে সে পরে দেবে বলে বিলম্ব করতে থাকে সম্ভবত এক টাকার ভাংতি দেয়ার সমস্যার কারণে তার দেরি হচ্ছে মনে করে তাকে ডেকে আবার আরেকটি ১০ টাকার নোট দিয়ে ৫ টাকার নোটটি ফেরত নিই। ধারণা ছিল, দশ টাকার নোট দিলে দুই টাকা হিসাবে বাকি আট টাকা ভাংতি দিতে তার সমস্যা হবে না। কিন্তু আমি আমার গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি পৌছা সত্ত্বেও তাকে নির্বিকার দেখে আমার পাওনা বাকি টাকা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং আমি নাকি তাকে শুধু দশ টাকার একটি নোট দিয়েছি বলে জবাব দেয় ও তর্কবির্তকে লিপ্ত হয়। একই সঙ্গে মারমুখী আচরন করে। মানুষের নৈতিকতা যে কত নিচে নেমে গেছে তা অনুধাবন করে আমি হতবাক ও দুঃখিত হই। বিষয়টি নিয়ে আমি সংশিষ্ট বাস মালিকের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

রফিকুল আলম/ কাঁঠালবাগান, ঢাকা।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধের উপায়

আমাদের দেশে বর্তমানে যে হাড়ে সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে করে জনগন স্বাভাবিক মৃত্যুর ভরসা হারিয়ে ফেলেছে। আজকাল অনেকেই রাস্তায় বেরুতে ভয় পান। সকালে অফিসে গিয়ে অনেকেই বিকেলে করে ফেরেন না। আত্মীয় স্বজনরা খবর পান হাসপাতালে লাশ গ্রহণ করতে যাবার জন্য। এক জরিপে দেখা গেছে ৯০% দুর্ঘটনা শুধু বাস-ট্রাকের কারনেই ঘটে। এছাড়া আমাদের দেশের যানবাহন মালিক ও চালকেরা অধিকাংশই ট্রাফিক আইন মেনে চলে না। এ ক্ষেত্রে অনেকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে বাস চালকের খামখেয়ালির জন্য। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে আমি কতিপয়ে প্রস্তাব পেশ করছি।

(১) প্রত্যেককে ট্রাফিক আইন মানতে বাধ্য করা
(২) সকল ভাঙ্গা রাস্তা সংস্কার করা
(৩) লাইসেন্স বিহীন সকল যানবাহন আটক করা
(৪) রাস্তায় গতিরোধকের সংখ্যা বাড়ানো
(৫) ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো

কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করবেন বলে আশা রাখি। এ ব্যাপারে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

মোহাম্মদ মাহফুল্লাহ।
চট্টগ্রাম।

মাননীয় সম্পাদক সাহেব সমীপেষু, পত্রের শুরুতে আপনাকে ও আপনার সকল সহকর্মীদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা। আমি একজন চিকিৎসা সাময়িকী'র নিয়মিত পাঠক। এই গল্প গুলি আমার খুব ভাল লাগছে, দয়া করে মাসের দুই/এক তারিখের মধ্যে যেভাবে পাই সে ব্যবস্থাটুকু করলে আপনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকবো। আর চিকিৎসা সমায়িকী'র সকল পাঠক-পাঠিকাদের জানাই শুভেচ্ছা।

অসিম চৌধুরী
মীরসরাই, চট্টগ্রাম।

ভাই চৌধুরী সাহেব। জীবন থেকে নেয়া গল্প একটি ধারাবাহিক নিয়মিত বিভাগ। তবে প্রত্যেক সংখ্যাতেই তা ছাপা হবে এমন নয়। ও বিভাগে কোন গল্প পেলেই কেবল আমরা তা ছাপাতে পারি। না পেলে কি করে ছাপাবো বলুন? আমারা আগামী সংখ্যা থেকে ইনশাআল্লাহ দু/এক তারিখেই যাতে আপনাদের হাতে প্রত্রিকাটি তুলে দেয়া যায় সে ব্যবস্থাই নিয়েছি। দোয়া করবেন। ধন্যবাদ আপনার চিঠির জন্যে।

মাননীয় সম্পাদক সাহেব,
আমার সালাম নিবেন। আপনার পত্রিকা আমার কোমল হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। আপনার পত্রিকার তুলনা হয় না। তাই কাজের ফাঁকে আপনার চিকিৎসা সাময়িকী পাঠ করে অবসর সময়টুকু কাটিয়ে দেই। আমি এই পত্রিকায়ে বাস্তব কিছু কথা নিয়ে গল্প লিখব। জানিনা আপনার পত্রিকার গল্প লিখে ঠাঁই পাবো কিনা, যদি আপনার পত্রিকায় ঠাঁই দেন তা হলে প্রতি সংখ্যায় ছোট ছোট গল্প পাঠাব এবং কোন বিভাগে গল্প লিখলে ছাপাবেন একটু দয়া করে এই সংখ্যায় জানাবেন। আমি আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

মোঃ আমিন/মৌলভী বাজার
ভাই আমিন। আমাদের পত্রিকা আপনার ভালো লাগে শুনে খুশী হলাম। আপনি গল্প লিখে পাঠিয়ে দিন মনোনীত হলে তা অবশ্যি ছাপা হবে। তবে আমার মনে হয় আপনার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার গল্প আরো বেশী করে পড়া প্রয়োজন। তাতে আপনার ভাব ভাষা আরও উন্নত হবে। আর একটি কথা আপনাকে না বলে পারছি না। লেখার সময় বানানের দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। আপনার বানান বড্ড ভুল হয়। ধন্যবাদ আপনার চিঠির জন্যে। আবারো লিখবেন।

সম্পাদক সাহেব,
প্রথমে আমার সালাম নিবেন। ৩/৪ মাস থেকে আমি চিকিৎসা সাময়িকীর নতুন পাঠক। আমার এক বন্ধু অনেকদিন থেকে পত্রিকাটি পড়ে। তার কাছে প্রায়ই যেয়ে পড়তাম। পড়ার পর এটি আমাকে এমনভাবে আকর্ষন করেছে আমি অন্যগুলোর কথা ভাবতে পারিনা চিকিৎসা সাময়িকীর প্রত্যেকটি কলাম আমার খুবই ভাল লাগে। আমি গ্রাহক হতে চাই তার জন্য কত লাগবে এবং কিভাবে টাকাটা পাঠাতে হবে তার নিয়মাবলী ফেরত ডাকে জানালে তা পাঠিয়ে দিতাম। পরিশেষে চিকিৎসা সাময়িকীর দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি।

নীপু/দোহার
স্নেহের নীপু। দোয়া ও স্নেহাশীষ জেনো। চিকিৎস্য সাময়িকী তোমার ভালো লাগে জেনে খুশী হলাম। তোমার চিঠি ছাপিয়ে দেয়া হলো। আর আমাদের বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা দুশো চল্লিশ টাকা। মাননীয় সম্পাদক সাহেব, আমার সালাম নিবেন। আপনার বহুল প্রকাশিত চিকিৎসা সাময়িকীর একজন নিয়মিত পাঠক আমি। অন্য ম্যাগাজিনের চেয়ে চিকিৎসা সাময়িকী আমার খুব বেশী ভালো লাগে। আমি কয়েক মাসের মধ্যে আল্লাহর অসীম রহমতে সৌদি আরব আল্লাহ পাকের পবিত্র স্থান মদিনা যাব সেখান থেকে কিভাবে নিয়মিত প্রিয় ম্যাগাজিন চিকিৎসা সাময়িকী পেতে পারি, বিস্তারিত ফেরত ডাকে জানালে উপকৃত হবো।

মনজুর আলম/কক্সবাজার
ভাই মনজুর আলম। আপনার ভাগ্যকে হিংসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আল্লাহর খাস রহমত না থাকলে কেউ আমার প্রিয় নবীর দেশে যেতে পারে না। সেদিক দিয়ে অবশ্যি আপনি ভাগ্যবান। যাক আপনি যা জানতে চেয়েছেন তা হচ্ছে আপনাকে মদিনায় প্রতি কপি পত্রিকা পাঠাতে আমাদের খরচ হবে ২৭.৫০ টাকা আর আমাদের প্রতি কপি পত্রিকার দাম ২০ টাকা একুনে ৪৭.৫০ টাকা পড়বে। আপনার হাত পর্যন্ত পৌছাতে এক কপি খরচ। আর আমরা এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করি না। অতএব আপনাকে ৫৭০ টাকা (বাংলাদেশি টাকা) পাঠালে আমরা এক বছর পত্রিকা পাঠাতে পারবো। আশা করি আপনার জিজ্ঞাসার জবাব পেয়েছেন। আপনার জন্যে আমাদের শুভ কামনা রইলো। তবে পোস্ট বদনাম্বারে আমরা পত্রিকা পাঠাই না। আপনাকে পুরো ঠিকানা দিতে হবে।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাহেব,
আমার সালাম রইল। আপনার বহুল প্রচারিত চিকিৎসা সাময়িকী আমার খুবই ভালো লাগে। তাই বহুদিন ধরে পড়ে আসছি এবং রোগ জিজ্ঞাসা, ব্যবস্থাপত্র বিভাগে চিঠিও লিখেছি কিন্তু তার কোন উত্তর পেলাম না। তাই এবার ফেরত ডাকে লিখলাম। আশা রাখি ফেরত ডাকে আমার এই ক্ষুদ্র লেখাটি স্থান পাবে। হাসনা/খুলনা।
বোন হাসনা। আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। চিকিৎসা সাময়িকী আপনার ভালো রাগে জেনে খুশী হলাম। আপনার অন্য বিভাগে লেখা চিঠিগুলো সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারবো না। যদিও জবাব দেবার মতো কোন কথা ছিল না তবু আমার কাছে লেখা চিঠির জবাব দিলাম। এবার খুশী তো? শুভেচ্ছা রইলো। আপনার পাঠানো ছবি পেয়েছি।

মান্যবরেষু সম্পাদক সাহেব,
আপনার প্রতি রইল আমার জমিয়ে রাখা অন্তরের অন্তঃস্থল হতে সালাম। আমি আপনার প্রচারিত পত্রিকা জগতের একমাত্র চিকিৎসা সাময়িকীর নিয়মিত পাঠক। প্রিয় ম্যাগাজিনটির সব বিভাগই আমাকে সমভাবে আকর্ষন করে।

সম্পাদক সাহেবকে
আমার এক গুচ্ছে শুভেচ্ছা জানাবেন।
যাক্ এখন আমার একান্ত জিজ্ঞাসা ও জানার প্রত্যাশা হলঃ বর্তমান "রোগ জিজ্ঞাসা" এবং "প্রশ্নোত্তর" বিভাগ দুটো অনিয়মিত কেন? যদি ভাই অনিবার্য কারণ ছাড়াই ঐ বিভাগ দুটো বাদ দেন তাহলে মুগ্ধময় এই পত্রিকাটির ভাবমূর্তি বিনষ্ট হতে পারে। তাই আশা করি আগামী সংখ্যায় ফেরত ডাকের মাধ্যমে আপনার সদয় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে কৃতার্থ করবেন। এ প্রত্যাশায় আজাদ/চাপাইনওয়াবগঞ্জ।

ভাই, আজাদ
আপনার শুভেচ্ছা সম্পাদক সাহেবকে পৌছে দেয়া হয়েছে। না ভাই: শুধু জায়গার অভাবেই ও দুটো বিভাগ ছাপানো হয়না বলে আমারা দুঃখিত। এ সংখ্যায় থেকে রোগ জিজ্ঞাসা বিভাগ নিয়মিতই ছাপা হবে। তবে রোগ জিজ্ঞাসা বিভাগটি অব্যশই ছাপা হবে, দোয়া করবেন। আপনি আমাদের শুভোচ্ছা ও ভালোবাসা নিন। আর খেয়াল রাখুন প্রশ্নোত্তর বিভাগটির নাম বদলে রাখা হয়েছে গাইনিকোলজি।

মান্যবর সম্পাদক সাহেব,
আপনার প্রতি রইল অন্তরে জমিয়ে রাখা অন্তরের অন্তঃস্থল হতে অফুরন্ত রজনীগন্ধার সুবাস ও সালাম। আমি আপনার 'চিকিৎসা সাময়িকী'র নিয়মিত পাঠক। বলতে গেলে 'চিকিৎসা সাময়িকী' আমার অবসরের সঙ্গী। বাৎসরিক চাঁদার হার ফেরত ডাক বিভাগের মাধ্যমে জানালে খুবই খুশি হবো। পরিশেষে আপনাকে ও সাময়িকীর সকল পাঠক ও পাঠিকাকে আন্তরিক মোবারক বাদ জানিয়ে শেষ করলাম।

সুমন মেলান্দহ, জামালপুর
ভাই সুমন। আপনি আমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা নিন। আপনি প্রতি কপির জন্যে বিশ টাকা করে পাঠিয়ে দিলে ও দুটো সংখ্যার আমরা অফিস থেকে সংবরাহ করতে পারবো। এ ব্যপারে আপনি সার্কুলেশন বিভাগ বা প্রচার বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক সাহেব,
সালাম নেবেন, আশা রাখি খোদার রহমতে ভাল আছেন, যাক, কথা হলো যে, আমি আপনাদের মাসিক চিকিৎসা সাময়িকীর বহু পুরাতন গ্রাহক ও পাঠক, আমি আপনাদের এ পত্রিকায় দুকলম লিখছি, আশা করি ফেরত ডাকে উত্তর দিবেন। আমি একটি জীবনী গল্প পাঠালাম এই পত্রিকায় ছাপালে খুশী হব। গল্পটি সমাপ্ত করি নাই। যদি প্রচার করেন তবে, বাকী অংশ পরের বারে পাঠাব। গল্পটি মনোনীত হল্যে কিনা উত্তরে জানাবেন এটা আমার অনুরোধ। সামনে মাসের সংখ্যায় ছাপালে খুশী হব। চিকিৎসা সাময়িকীর দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করলাম।

এমদাদ হোসেন/ ঢাকা।
ভাই এমদাদ হোসেন। আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। দেখুন ভাই হোসেন, কোন লেখা পত্রিকার অফিসে পাঠিয়েই তাগাদা দিতে শুরু করবেন না। তাতে একটা বিরক্তির কারণ সৃষ্টি হয়। আর এ বিরক্তিতে অনেক সময় ছাপার উপযুক্ত লেখাও অফিসের ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে চলে যায়। আমাদের নিয়ম অবশ্য পৃথক। আমরা ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিই না। তবে ছ'মাসের মধ্যেও যদি লেখাটি প্রকাশিত না হয় ধরে নেবেন আপনার লেখা প্রকাশোপযোগী হয়নি। তবে অমনোনীত লেখা আমাদের পক্ষে ফেরত দেওয়াও সম্ভব নয়। আপনার কোন গল্প আদৌ আমাদের দফতরে এসেছে কিনা তা এই মুহূর্তে বলাও আমার পক্ষে সম্ভব নয় ভাই। খোঁজ নিয়ে দেখছি শুভেচ্ছা রইলো।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার পরিচালিত ও প্রকাশিত ম্যাগাজিন "চিকিৎসা সাময়িকী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চাই। অতএব, বিনীত প্রার্থনা এই যে, অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে নিয়মিত একজন গ্রাহক হিসাবে গ্রহন করতে ও এর সুব্যবস্থা গ্রহন করতে আড্ডা হয়।

আব্দুস সালাম/ নেত্রকোনা
ভাই আব্দুস সালাম সাহেব। সালাম নিন। চিকিৎসা সাময়িকীর বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদার হার ডাকমাশুল সহ দুই শত চল্লিশ টাকা বর্তমানে। আপনি সম্পাদকের নামে টাকাটা ডাকযোগে পাঠিয়ে দিন আপনাকে গ্রাহক করে নেয়া হবে। ধন্যবাদ রইলো আপনার চিঠির জন্যে।

শ্রদ্ধাভাজন ফেরত ডাকের উত্তর দা সাহেব,
লিপির প্রারম্ভে আমার শুভেচ্ছা জানবেন। আগে আমরা মাসের প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ ১-৭ তারিখের ভিতর পত্রিকা পেতাম। কিন্তু বর্তমানে ৩/৪ মাস যাবৎ মাসের ২ য় সপ্তাহের শেষের দিকে কেন পাচ্ছি? এটি অবহেলায় নাকি অন্য কোন কারণে? জানালে খুশী হব। পরিশেষে সবাইকে ভালবাসা জানিয়ে আজকের মত বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ। কামাল হোসেন/মঠবাড়িয়া ভাই কামাল হোসেন। দোয়া ও শুভেচ্ছা জানবেন। হ্যাঁ ভাই, চিকিৎসা সাময়িকী বাজারে যেতে যেতে কমাস ধরে এই যে প্রথম সপ্তাহ পেরিয়ে যায় মূলতঃ এর জন্যে আমরাই দায়ী। তবে কিছু আনুসঙ্গিক কারণও থাকে যার জন্যে এমনটি ঘটে। তবে আগামী থেকে সম্ভবতঃ আমরা সে কারণগুলোর বাধা অতিক্রম করতে পারবো। দোয়া করবেন।

ফেরত ডাকে উত্তর জানতে লিখুন

ইনবক্সে প্রতিদিনই চিঠি পাঠাচ্ছেন অনেক পাঠক। এজন্য চিকিৎসা সাময়িকী-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের চিঠির উত্তর জানতে চাইলে লিখুন আমাদের ঠিকানায় চিকিৎসা সাময়িকী

চিকিৎসা সাময়িকী

৭০/ই পল্টন লাইন, (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০।
(জনতা ব্যাংক বিল্ডিং)

•আমি এক বিবাহিতা মহিলা বয়স ৩১। ৫ বছর আগে আমার বিয়ে হয়েছে। ছেলের বয়স ৩। সহবাসের পর আমার লালচে স্রাব হয়, এবং নিম্নাঙ্গে জ্বালা ও ব্যথা অনুভব করি। স্বামী এই নিয়ে আলোচনা করতে চান না। আমার কোনও কঠিন রোগ হল না তো?

>> লালচে স্রাব হওয়া মানে স্রাবের সঙ্গে শরীরের রক্তও মিশে আছে। আপনার উচিত তাড়াতাড়ি কোনও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করানো। এটা বেশিদিন ফেলে রাখা উচিত নয়। আপনার স্বামী কোনও আগ্রহ না দেখালেও আপনি কোনও নিকট আত্মীয়র সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যান। চিকিৎসা না করলে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে।

•আমার বয়স ২৩ বছর। আমার স্বামীর ৩০। দেড়বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। এখনও গর্ভধারন হয়নি। সমস্যা হল আমার স্বামীর যৌনতা বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই। আমরা সপ্তাহে একবার মিলিত হই। ডাক্তারি পরীক্ষায় স্বামীর শারীরিক ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিক প্রমানিত হয়েছে। আমি কীভাবে গর্ভধারন করি?

>> প্রত্যেক মাসিকচক্রের কয়েকটি মাত্র দিনেই স্ত্রী পুরুষ মিলিত হলে গর্ভধারন হতে পারে। ওভারি থেকে ডিম্ব বের হওয়ার জন্য মাসিকচক্রেনা মধ্যবর্তী সময়টাই আদর্শ। বিবাহিত জীবনে নানা কারণে স্বামীর যৌনআগ্রহ কম হতে পারে। ব্যক্তিগত আবেগ, ঝগড়া, মান-অভিমান চেপে রাখা রাগ ইত্যাদিও এর মূল কারন হতে পারে। এসবের থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। মনে সুখ-শান্তি না থাকলে যৌনআগ্রহ কমে যায়। আবার সহবাসের সময়ে যথেষ্ট আনন্দ না পেলেও যৌনতার প্রতি আগ্রহ চলে যায়। কিছু কিছু ওষুধ, যেমন ডাইজাপাম, সিডেটিভ, হাই ব্লাড প্রেশার, কমানোর ওষুধ খেলে যৌনইচ্ছা কমে যায়। আপনার স্বামীর যৌনআগ্রহ চলে যাবার কারণ কোনটা, সেটা অনুসন্ধান করুন। দুজনে একটা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে পরস্পরের পাশে দাঁড়ান। এভাবে চললে আপনি সহজেই গর্ভধারন করতে পারবেন।

•আমার মেয়ে একটু বাতিকগ্রস্থ। রোজ সে ঘন্টার পর ঘন্টা হাত ধুতে থাকে, কাপড় কাচতে, গোসল করতেই ব্যস্ত থাকে। ডাক্তার বলেছেন এটা অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। আমরা মেয়েকে ওষুধ খাইয়েছি। তেমন উপকার পাইনি। এখনও ওর বিয়ে হয়নি। ভয় পাই, বিয়ের পর অন্যের বাড়ি গিয়ে কী করে কাটাবে ও। এই রোগের কোনও স্থায়ী চিকিৎসা আছে কি?



>> অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার তরুণ বয়সের অসুখ। এতে মনে ভুল ধারণা, নানান ভুল দৃষ্টিভঙ্গি গাঁথা হয়ে যায়। এই ভুল ধারণার ফলে সেই ব্যক্তি অস্বাভাবিক আচরন করতে থাকে। সে বুঝতে পারে তার আচরন সঠিক হচ্ছে না, কিন্তু তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রন থাকে না। অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারের চিকিৎসা না করালে রোগী গভীর অবসাদের শিকার হতে পারে। এর ফলে তার ভেতর দুশ্চিন্তা, সবার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকার ইচ্ছা, নেশাসক্তি, ঘুমের ওষুধ খাবার ইচ্ছা ইত্যাদি সমস্যা আসতে পারে। রোগের প্রভাবে তার সামাজিক ও বিবাহিত জীবনে প্রতিকূলতা আসে। অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারের চিকিৎসায় ওষুধ ও সাইকোথেরাপি, দুই-ই উপযোগী হয়ে থাকে। ওষুধের মধ্যে প্রধানত ক্লোমিলিমিন ফ্লোর্যেটিন ও সরটরালিন ব্যবহৃত হয়। ওষুধের সাহায্যে ৪০ ভাগ রোগীর মধ্যে উন্নতি হয়। কিন্তু বহুদিন ওষুধ খেলে তবেই এই পরিবর্তন দেখা যায়। ওষুধ শুরু করলে তা মাঝে বন্ধ করা উচিত নয়। ডাক্তারের পরামর্শেই তা বন্ধ করা উচিত। নইলে রোগ ফের বেড়ে যেতে পারে। রোগীর ভুল ধারণাগুলি দূর করার জন্য বিহেভিয়ার থেরাপি সাহায্যে রোগীর অস্বাভাবিক কাজ ও ব্যবহারকে স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব। মানসিক স্থিরতা আনতে নিয়মিতভাবে রিল্যাশেন ব্যায়াম করা দরকার।

•ছোটোবেলায় আমার পরিবারের একজন আমাকে হস্তমৈথুনে বাধ্য করত। সে আমার শরীরের নানা অংশ স্পর্শ করত। অপরিনত বয়সের জন্য আমি কিছু বুঝতাম না। মাকে অভিযোগও জানাইনি। এখন আমি একটা সমস্যায় গড়েছি। এর জন্যই কি আমার ঋতুস্রাব কম বয়সেই শুরু হয়েছে? কী করি?

>> বয়ঃসন্ধির সময়টাতে ঋতুস্রাবের সূত্রপাত হওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা। কোন বয়সে এটা শুরু হবে, তা সঠিক বলা সম্ভব নয়। প্রত্যেক মেয়ের ঋতুস্রাব শুরুর বয়স আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। এছাড়া স্থানীয় আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস কিংবা বংশগত কারণেও উপরও ঋতুমতি হওয়া নির্ভর করে। বিগত ১০০ বছর ধরে করা সমীক্ষায় দেখা গেছে, মেয়েদের ঋতু শুরু হবার বয়সটা ক্রমশ কমছে। গড়ে মেয়েদের ১০-১২ বছর বয়সে ঋতুস্রাব শুরু হয়। আপনি আপনার ঋতু শুরুর বয়সটা উল্লেখ করেননি। তাই বলা যাচ্ছে না, তা আগে শুরু হল, না স্বাভাবিক বয়সেই। তবে এটা খেয়াল রাখবেন যে, এরপর থেকে কেউ যেন আপনার সঙ্গে কোনওরকম জোরজবরদস্তি না করে।

• আমি পেশায় একজন সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ। আমার স্বামীও অফিসের কাজের সূত্রে প্রায়ই টুর্যে যান। আমার ১৫ বছরের মেয়েকে খুব কম সময় দিতে পারি। সেই সময়ে আমার শাশুড়ি ওদের সঙ্গে থাকেন। কিছুদিন হল বুঝতে পারছি আমার শাশুড়ির নানা মন্তব্যের জন্যে আমার মেয়ের মনে আমার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জন্মাচ্ছে। আমি কিছু বললেই ও বলে ওঠে, তুমি কিছু বোঝো না, তুমি তো সারাদিন বাইরে মজা করো। আমার কি চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত?
কাকলি/রাজশাহী

পরামর্শ
মা চাকরি করলে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয় না, এই প্রাগৈতিহাসিক ধারনা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। আপনার সমস্যা শুধু মেয়েকে নিয়ে নয়, আপনার শাশুড়িকে নিয়েও। স্বামীর সঙ্গে এই সমস্যাটা নিয়ে সিরিয়াসলি আলোচনা করুন। শাশুড়ির সামনেই মেয়েকে বোঝান বাবার মতো মায়ের কাজ করাটাও একইরকম জরুরি ওকে ভাল করে বড় করে তোলার জন্যে। ওকে বলুন যে, ওর স্কুলে যাওয়াটাও যেমন জরুরি, আপনারাও অফিস যাওয়াটা তেমনই জরুরি। অফিস থেকে মাঝে মাঝে মেয়েকে ফোন করে গল্প করুন, পড়াশোনা বা বন্ধুবান্ধবের খোঁজ খবর নিন।

• আমার বয়স ২১ ও আমার স্বামীর বয়স ২৫। বিয়ের একদিন পর আমরা প্রথম ইন্টারকোর্স করি। তার কিছুদিন পর আরও দু'বার শারীরিকভাবে মিলিত হই। প্রতিবারই আমার ভ্যাজাইনাতে ও ওর পেনিসে খুব ব্যথা লাগে। মেডিক্যাল চেকআপে আমার কোন ত্রুটি ধরা পড়েনি। কিন্তু ডাক্তার আমার স্বামীকে সারকাম-সিশন অপারেশন করতে বলেছেন অথচ আমার বাথার কারণ কী, কীভাবে তার উপশম হবে, সে সর্ম্পকে কোনও সদুত্তর পাইনি। তাছাড়া আমার স্বামীর ফোরস্কিন বেশ মোটা। এই বয়সে এরকম একটা অপারেশন ঝুঁকিবহুল নয় তো? কোনও ওষুধ ব্যবহার করে কি সুফল পাওয়া যেতে পারে।
ফেন্সী/জয়পুরহাট

পরামর্শ
প্রথম দু'তিনবার ইন্টারকোর্সের সময় ব্যথা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। যদি দু'জনের কারও শারীরিক জড়তা থাকে কিংবা অর্গাজম ঠিকমতো না হয়, তা হলেও ব্যথা লাগতে পারে। ফোরস্কিন মোটা হওয়াও ব্যথার একটা কারন হতে পারে। ডাক্তার যখন বলেছেন, সারকামসিশন অপারেশন প্রয়োজন, তখন এটা নিয়ে ভাবার কোনও কারণ দেখছি না। তাছাড়া এটি খুব সাধারন অপারেশন। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই এবং বয়সও কোনও বাধা নয়। ওষুধ দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হবে না।

• আমার বয়স ১৮ বছর। ১৫ বছরের এর একটি মেয়েকে আমি। ভালবাসি। মেয়েটিও আমার প্রতি আসক্ত। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট ভাবও ছিল। কিন্তু আমাদের দু'জনেরই সম্পর্কের ব্যাপারে জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর সেই সম্ভাব নষ্ট হয়ে গেছে। আমি পড়াশোনায় বেশ ভালই ছিলাম। একেবারে ক্লাস ওয়ান থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত ক্লাসে ফার্স্ট হই। মাধ্যমিকে জিপিএ ৫ পাই। এবার উচ্চমাধ্যমিক দিচ্ছি। কিন্তু আমার সেই বান্ধবীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমি পড়াশোনায় মনও দিতে পারছিনা। আমি মেয়েটিকে যখন প্রথম প্রেম নিবেদন করি তখন ও আমাকে প্রত্যাখান করে। ফলে আমি মানসিকভাবে খুব ভেঙ্গে পড়ি। নানরকম নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ি। মাস্তানি শুরু করি। ফলে কলোনিতে আমার ইমেজ খারাপ হয়ে যায়। মেয়েটি প্রায় একবছর পর আমাকে ওর ভালোবাসা দেয়, তারপর আমি সব নেশা ছেড়ে দেই, আবার সৎপথে চলতে শুরু করি। কিন্তু মেয়েটির বাড়ির লোকেরা সেটা মানতে চাইছেন না। তাঁরা আমাকে যারাণ ছেলে ভেবে, মেয়েকে আমার সঙ্গে মিশতে দেন না। আমাদের প্রেম নিঃস্বার্থ বিশুদ্ধ। আমরা কি কোনওভাবে বিয়ে করে নিতে পারবো?

পরামর্শ: না, তোমরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক। তোমাদের নিজেরা বিয়ে করে নিলে তা আইনানুগ বৈধতা পাবে না। তোমাদেরকে অন্তত আরও ৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

• আমি একজন ১৯ বছরের তরুণী। আমি বর্তমানে বি এ (ফাষ্ট ইয়ার) এ পড়ছি। আমার একটা বিশেষ সমস্যা আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি। আমি ক্লাস সেভেন থেকে একজনকে ভালবাসি। আমি যাকে ভালবাসি সে আমার থেকে ৩ বছরের বড়। ক্লাস টেন-এ ওঠার পর থেকে ভুল বোঝাবুঝির ফলে ৪ বছর আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসতাম কিন্তু প্রকাশ করতাম না। সে আমার ভাইয়ের বন্ধু। আমার বাড়ির লোক এই নিয়ে আমার উপর খুব অত্যাচার করত। ইদানিং আবার যোগাযোগ করছি বলে বাড়তী খুব অশান্তি হচ্ছে। মাঝের ৪ বছরে ও একটু বাজে হয়ে গেলেও এখন ভাল হয়ে গেছে। ও বলেছে পরীক্ষা দেবে। একটা বিজনেস করবে। ও আমাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আমি পালাতে চাই না।
প্রিয়া/ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

পরামর্শ: একদম পালিও না। একজন সাঁতার না জানা মানুষের পানিতে পড়লে যেমন অবস্থা হয় তোমার ঠিক সেইরকম অবস্থা হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাবা মা বাড়ির সম্মানও নষ্ট হবে। ছেলেটির জন্য অপেক্ষা কর। ও পরীক্ষা দিক। পাশ করুক। ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত হোক। তোমার পরিবারের কাছে ও যে ভাল হয়ে গেছে তা প্রমান করুক। তুমিও দেখো ও তোমার উপযুক্ত কি না। বিয়েটা কোনও ছেলেখেলা নয়। এখন 'পালালে' পরে যে এই পালানোর দাম দিতে হবে তা কিন্তু বিপদ ডেকে আনবে।

• আমি একজন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। আমার মা নেই। আমরা দুই বোন। আমি বড়, স্নাতক পরীক্ষার্থী। বছর দুয়েক আগে, আমি আমার চেয়ে ১১/১২ বছরের বড় একটি সুদর্শন সুশিক্ষিত ছেলের প্রেমে পড়ি। ও আমার বাড়ির কাছেই থাকে এবং আমদের বাড়িতে ওর যাতায়াত আছে। তাই ওর সঙ্গে সর্ম্পক হলেও বাড়ির কেউ তা জানতে পারেনি। ইতিমধ্যে ও নিজের কেরিয়ার গঠনে মন দেয়। কিন্তু সম্প্রতি আমি জানতে পারলাম যে ও আমার সঙ্গে এত দিন ফ্লার্ট করছিল ও আরেকটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে এবং তাকেই ও বিয়ে করবে বলে মনস্থির করেছে। কথাটা জানতে পেরে আমি ওকে সরাসরি এ ব্যাপারে প্রশ্ন করি। ওর কাছ থেকে তেমন সদুত্তর না পেলেও, আমি বুঝতে পারি এই কথাটা সত্যি। তখন ওকে

ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু ওকে দিনরাত চোখের সামনে দেখতে পাওয়ায় আমার মনের দুঃখ কিছুতেই কমে না। আমি কেঁদে কেঁদে শরীর খারাপ করে ফেলি। অবশেষে সুস্থ হয়ে উঠলেও বুঝতে পারি যে, ও আমাকে নেশার মতো আচ্ছন্ন করে ফেলে। ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না, তাই এই সম্পর্কের কোনও ভবিষ্যৎ নেই জেনেও আবার তার পুনরাবৃত্তি করি। কিন্তু আমি মুক্তি চাই। কী করব বলুন? ওর সঙ্গে চুম্বন ছাড়া কোনও শারীরিক সম্পর্ক হয়নি।
লিলি চৌধুরী/ ঢাকা।

পরামর্শ:
যে কোনও নেশারই চিকিৎসা আছে, তবে নেশার চিকিৎসার জন্য প্রথমে নেশাগ্রস্তর নেশা ছাড়ার চূড়ান্ত ইচ্ছে প্রকাশ করা দরকার। তোমার সে ইচ্ছা আছে মনে হয়, তবে এখনও মনের জোর পাচ্ছ্যে না। শোনো, ড্রাগের নেশা বা মদের বা সিগারেটের, যে কোনও নেশাই ছাড়ার সময় শারীরিক কষ্ট ও অসুস্থতা দেখা দেয়। এক বলে 'উইথড্রয়াল সিনড্রোম'। সুতরাং তোমার ওই প্রেম নেশা ছাড়তেও মনে কষ্ট ও শারীরিক অসুস্থতা দুই-ই হবে। মন শক্ত করো। ওকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নাও। তারপর মন খারাপ হলেও সহ্য করো। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করো, পড়াশোনা করো। যদি পারো তো অন্য কোথাও কিছুদিনের জন্য বেড়াতে যাও। না পাড়লে, গল্পের বই পড়ো, নিজের পায়ে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখো। এটাই তোমাকে ওই নেশা ছাড়াতে সাহায্য করবে। দেখো ওকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করলে ও হয়তো তোমার মূল্য বুঝবে। কিন্তু এর উপর বেশি আশা রেখো না। তুমি যদি জীবনে সাফল্য পাও, দেখবে তোমার সব দুঃখ কমে যাবে।

• আমার বয়স ১৮। এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। গত চার বছর হল আমি একটি ছেলেকে ভালবেসেছি। ছেলেটি খুব সৎ ও সরল। আমাকে ও প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। ওদের নিজস্ব ব্যবসা আছে। কিন্তু ও মাধ্যমিক ফেল। এই কারণে আমার বা ড়র লোকেরা ওর সঙ্গে আমার মেলামেশার ব্যাপারে আপত্তি করছেন। আমার বাবা-মা উচ্চশিক্ষিত। বাড়িতে একটা শিক্ষিত পরিবেশ আছে। স্বাভাবিকভাবেই সবার ইচ্ছা আমিও ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষিত হব। বিদেশও যেতে পারি। এই অবস্থায় ওই ছেলেটিকে বাড়ির কেউ মেনে নিতে পারছেনা। তাই ওরা বলেছে আমি যদি ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না বন্ধ করি তাহলে ওর ক্ষতি করে দেবে। ওর ক্ষতি হোক আমি চাই না, তাই ওর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করেছি। কিন্তু ও আমাকে ভুল বুঝছে এই ভেবে অহরহ কাঁদছি। আমি ওকে ভালবাসি কিন্তু ও কি আমাকে কোনও দিন ক্ষমা করবে?
ডোনা/চট্টগ্রাম

পরামর্শ:
তুমি বোধহয় খুব বেশি হিন্দি সিনেমা দেখ তাই নয় কি? তাই তিলকে তাল করছ। তোমার বাড়ির যা পরিবেশ তা থেকে মনে হয় তোমার পক্ষেও বিয়ের পরে অশিক্ষিত পরিবেশে বাস করা শক্ত হবে। তোমার বাবা-মা তোমার ভালই চান নিশ্চই। তাই তাঁরা চান তুমি পড়াশোনা করে স্বাবলম্বী হও। তোমার উচিত বাবা-মার কথা মতো পড়াশোনা করা। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরও যদি ওই ছেলেটির প্রতি তোমার আকর্ষন একই থাকে তাহলে বুঝবে তোমরা একে অন্যের জন্য উপযুক্ত।

• আমি বিএসসি পাঠরতা ছাত্রী। বছর দুই হলো আমি একটি অবাঙ্গালি ছেলের প্রেমে পড়েছি, যার বয়স ৩৯। ও ব্যাঙ্ক এর ম্যানেজার। আমাদের সম্পর্ক এখন শারীরিক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বাবা-মা কে ওর সম্পর্কে বলেছিলাম কিন্তু ওরা রাজি নন, কারণ ও বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়, ২০/২২ বছর। তাছাড়াও ডিভোর্সি। এছাড়াও বাবা-মা শুনেছেন ওর নাকি স্বভাব ভালো নয়। মেয়েদের ফাঁদে ফেলাই ওর ধর্ম। আমি নিজেও কিছু কিছু শুনেছি। তাই বুঝতে পারছিনা আমার কী করা উচিত। কারণ ও আমাকে শুধু চুম্বনই করেনি, আমার দেহের নানা জায়গায় স্পর্শও করেছে। বহুবার বারণ করা সত্ত্বেও কিন্তু ও আমাকে ছাড়েনি। আমার ভয় কি ওর জন্য আমার সতীত্ব হারাব?
ডলি/ ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

পরামর্শ :
তুমি অযথা ভয় পাচ্ছ। তোমার যদি ছেলেটি সম্পর্কে মনে কোনও দ্বিধা থাকে তাহলে আর এগিয়ো না। তোমার বাবা-মা তোমার ভাল চান।

• আমার মেয়ের বয়স ১৬, এখনও পিরিয়ড শুরু হয়নি। খুব রোগা ও বেঁটে। ওর সব বন্ধুদের অনেক আগেই শুরু হয়েছে। এর কারণ কী? এর পর স্বাভাবিক জীবন থাকবে কি?
নুপুর/ঢাকা

পরামর্শ:
আপনার মেয়ের অসুখকে আমারা বলি প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়া। ঋতুস্রাব প্রথম শুরু হওয়ার সময় ১২ থেকে ১৬ বছর। কারও খুব আগে বা ৯ বছরে, কারও খুব দেরিতে বা আঠারো বছরেও শুরু। হতে পারে। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় মোটামুটি ১৩/১৪ বছর বয়সে পিরিয়ড শুরু হওয়ার জন্য পাঁচটি বিষয়ে সুস্থতা দরকার। স্বাভাবিক জরায়ু, ডিম্বকোষের স্বাভাবিক স্ত্রীহরমোন তৈরির ক্ষমতা, পিটুইটারি গ্রন্থির স্বাভাবিক হরমোন তৈরির ক্ষমতা, হাইপোথ্যালামাসের স্বাভাবিকতা এবং নারীত্বের পরিচায়ক স্বাভাবিত ক্রোমোজোম (৪৬ এখ) থাকা প্রয়োজন। এর মধ্যে একটি গন্ডগোল হলেই ঋতুস্রাব শুরু হতে পারবে না। প্রথমে আপনার মেয়েকে ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে। তারপর আল্ট্রাসোনোগ্রাম, ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি, রক্তে স্ত্রী হরমোনের ও খাইরয়েড হরমোনের মাত্রা এবং ক্রোমোজোমাল পরীক্ষা করতে হবে। যে কোনও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ এই পরীক্ষাগুলির সাহয্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করে আপনার মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন।

পরামর্শের জন্য লিখুন

এই বিভাগে চিঠি লিখে আপনি পেতে পারেন জীবনের যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান। দুজন ডাক্তার একজন আইনজীবি এবং একজন শিক্ষক এ বিভাগটি পরিচালনা করে থাকেন। তাই আপনার পরামর্শের জন্য লিখুন আমাদের ঠিকানায়

চিকিৎসা সাময়িকী
৭০/ই পল্টন লাইন, (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০।
(জনতা ব্যাংক বিল্ডিং)

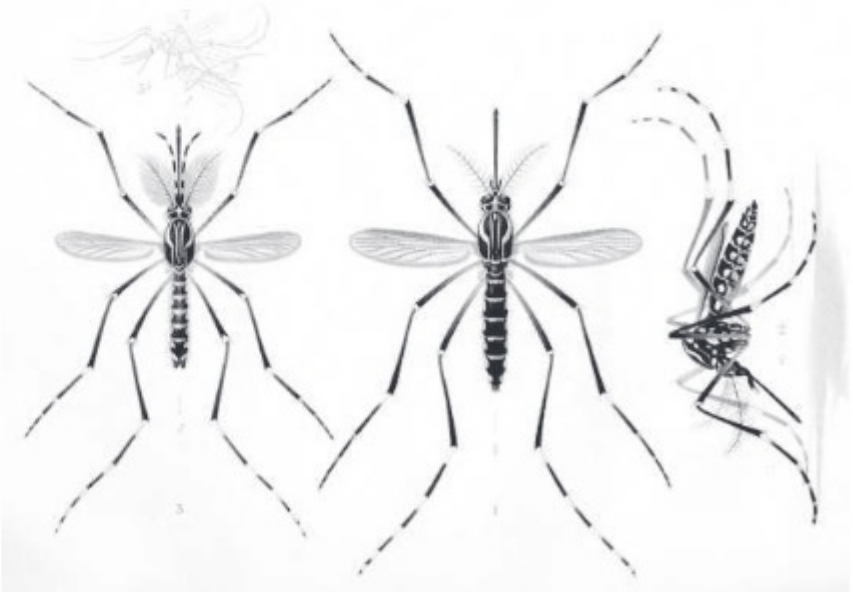
ডেঙ্গু

গত দুই দশক ধরে ডেঙ্গু আমাদের দেশে বেশ আলোচিত এক রোগ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। কিন্তু এই বছর ডেঙ্গুর প্রকোপ আকস্মিকভাবে তীব্র বিপর্যয় হিসেবে দেখা দেয় এবং জনসমাজে এক প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এর আগে কখনো সম্মুখীন হতে হয় নি। বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের প্রায় ১০০ টি দেশে এর প্রাদুর্ভাব হয়েছে বা এখনো আছে। আমাদের দেশের চাইতেও আরো ভয়াবহ পরিস্থিতি অনেক রাষ্ট্রই সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে। সরকার এবং সকলের সহযোগিতায় আমরাও পেরেছি এবং ভবিষ্যতে আরোও কার্যকরভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় পরিকল্পনা মতো এগিয়ে যাবো। তাই ডেঙ্গুর এই মহামারী মোকাবেলায় আমাদের সকলের কী করণীয় তা আমরা এখানে আলোচনা করব।



ডেঙ্গু মশাঃ

ডেঙ্গু জ্বর Aedes Aegypti নামক মশা দ্বারা হয়ে থাকে। Aedes Aegypti মশা ছোট, গাঢ় বর্ণের হয়ে থাকে যার শরীরে ও পায়ে সাদা ডোরাকাটা দাগ থাকে ডেঙ্গু জ্বর এই মশা দ্বারা ছড়িয়ে থাকা পাঁচ ধরণের ডেঙ্গু ভাইরাসের যে কোনও একটির কারণে হয়ে থাকে যা মানুষের আবাসস্থল এবং তার আশেপাশে বংশবিস্তার করে থাকে। একটি মশা যখন ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড় দেয় তখন ভাইরাসটি মশার মধ্যে প্রবেশ করে। সংক্রমিত মশা যখন অন্য ব্যক্তিকে কামড় দেয় তখন ভাইরাসটি সেই ব্যক্তির রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে। এডিস মশা সারাদিনই কামড়ায়, কিন্তু বেশি কামড়ায় সূর্যোদয়ের পরে প্রায় দুই ঘন্টা এবং সূর্যাস্তের দুই বা তিন ঘন্টা আগ মুহূর্ত পর্যন্ত, রাতের উজ্জ্বল আলোতেও এডিস মশা কামড়াতে পারে। অনেকে বলে, এরা হাঁটুর উপরে উঠতে পারে না এবং শুধু পায়ে কামড়ায় কথাটা ঠিক নয়। মানুষের সাথে এরা বহুতল ভবনেও উঠতে পারে এবং সেখানে বাসা বাঁধতে পারে। এরা ঘরের অভ্যন্তরে, বাথরুম এবং অন্যান্য অন্ধকার স্থানে বসবাস করে থাকে। ঘরের বাইরে তারা শীতল এবং ছায়াময় স্থানে থাকতে পছন্দ করে। ডেঙ্গু মশা সাধারণত বাসা বাড়িতে থাকে এবং দিনের বেলা পানিতে জমে থাকা পাতা, শেওলা ইত্যাদি স্থানে বংশবিস্তার করে। বাতাসে তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নিচে চলে গেলে এডিস মশা কামড়ানোর মাত্রা অনেক কমে যায়। ১৬° সে. তাপমাত্রার নিচে এরা বংশবিস্তার করতে পারে না।



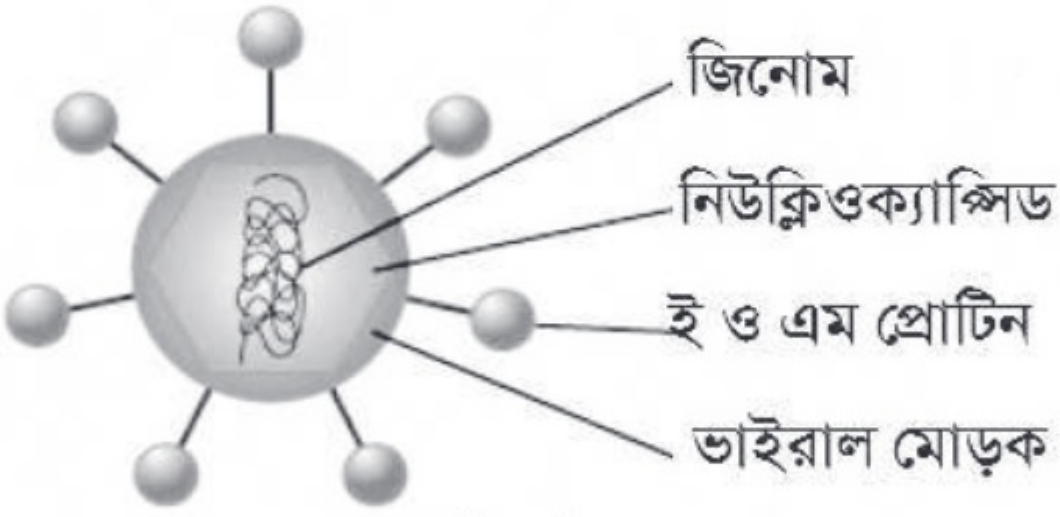
সে জন্য শীতকালে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত এডিস মশার উপদ্রব অনেক কম থাকে। তবে বন্ধ হয় না। যে কেউ যে কোন সময় এডিস মশার কামড়ে এ সময় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হতে পারে। তবে সাধারণভাবে মে হতে অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুর আক্রমণ বেশি থাকে এবং জুলাই হাতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

ল্যাকটিক অ্যাসিডের মতো কিছু রাসায়নিক পদার্থ মশাকে আকর্ষণ করে। কয়েক ক্ষেত্রে প্রমাণ রয়েছে যে একটি বিশেষ রক্তের গ্রুপ (ও) (0 positive blood group) অন্যান্য রক্তের গ্রুপ (এ বা বি) (A or B positive blood group) এর তুলনায় মশাকে বেশি আকর্ষণ করে।



ডেঙ্গু ভাইরাসঃ

ডেঙ্গু জ্বর মশাবাহিত ডেঙ্গু ভাইরাস Dengue Viruses (DENVs) দ্বারা হয়ে থাকে। এই ডেঙ্গু ভাইরাস পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে, যাদেরকে সেরোটাইপ বলে। ডেঙ্গু ভাইরাসের পাঁচটি ধরন বা সেরোটাইপ আছে: ডেনভি-১, ডেনভি-২, ডেনভি-৩, ডেনভি-৪ ও ডেনভি-৫। ডেঙ্গুর পাঁচ ধরনের সেরোটাইপের (DENV 1 to 5) সবগুলোই ফ্লাভিভিরিডি গ্রুপের এক ধরনের ফ্লাভি ভাইরাস। এরা প্রাণিদের শরীরে সংক্রমণ করে এবং এদের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন-জঙ্গলসমূহ।



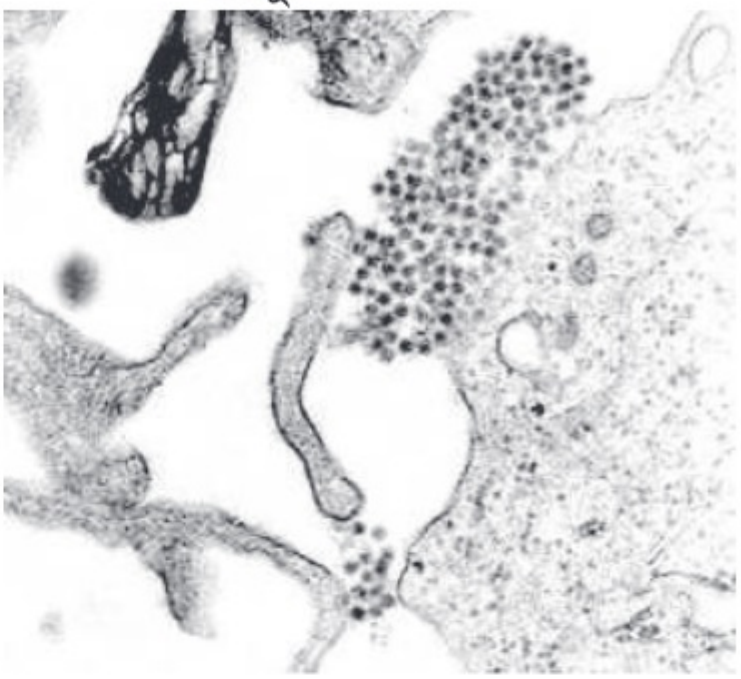
ছবি: ডেঙ্গু ভাইরাস

ডেঙ্গু ভাইরাস ফ্ল্যাভিভাইরিড এবং ফ্ল্যাভিভাইরাস জিনাসের একটি অংশ। অন্যান্য ভাইরাসগুলি যা একই পরিবারের অন্তর্গত এবং মানুষকে অসুস্থ করে তুলতে পারে তার মধ্যে হলুদ জ্বর ভাইরাস, পশ্চিম নীল ভাইরাস, জিকা ভাইরাস, জাপানি এনসেফালাইটিস ভাইরাস এবং টিকবাহিত এনসে-ফালাইটিস ভাইরাস রয়েছে। এই ভাইরাসগুলির বেশিরভাগই মশা বা টিক্ড দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে।শরীরের কোন অংশে যখন মশা কামড় দেয় তখন চামড়া ফুলে ওঠে।

এই ফুলে ওঠা অংশ কেবল অস্বস্তির উদ্রেকই করে না, উপরন্তু তা ডেঙ্গু, জিকা ইত্যাদি ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা ভাইরাস সংক্রমণকে ত্বরান্বিত করে। মশা যখন কামড় দেয় তখন এটির মাধ্যমে শরীরে তার লালা প্রবেশ করায়। মশাবাহিত অন্যান্য রোগ যেমন ম্যালেরিয়া, ওয়েস্ট নাইল এনকেফালাইটিস, চিকুনগুনিয়া, ফাইলেরিয়া ইত্যাদি রোগসমূহের চাইতে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি হবার আরেকটি কারণ হিসেবে ধারণা করা হয়, ডেঙ্গু মশার মরণ কামড়কে। ডেঙ্গু মশার কামড় বেশ শক্তিশালী এবং এর লালায় এক বিশেষ কেমিক্যাল বা পদার্থ, রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না যার কারণে কামড়ানোর স্থানটি সাথে সাথে লাল হয়ে ফুলে ওঠে এবং চুলকায়। ডেঙ্গু ভাইরাস শরীরের রক্তে প্রবেশ করলে যখন রক্তে ভাইরাসের পরিমাণ অতিরিক্ত বেড়ে যায় তখন তাকে বলা হয় ভাইরেমিয়া (viremia)। ভাইরাসকে প্রতিহত করার জন্য শরীরের প্রতিরক্ষাকারী কোষসমূহ বা ইমিউন সিস্টেম সক্রিয় হয় এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে, এবং ভাইরাসটি দূর করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া শরীরে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাইরাসটি প্রশমিত হয়।

প্রাথমিকভাবে এক রকমের সেরোটাইপ দিয়ে সংক্রমিত হলে শরীরে জীবনব্যাপী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। পরে অন্য সেরোটাইপ দিয়ে আক্রান্ত হলে ডেঙ্গু হেমোরোজিক জ্বর বা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম দেখা দেয়। আইইডিসিআর তাদের ডেঙ্গুবিষয়ক নিউজ লেটারে বলেছে, এই বিষয়টি পরিষ্কার নয় যে কেন কিছু সেরোটাইপের ভিন্নতা অন্যগুলোর চেয়ে এত বেশি মারাত্মক।

যে কোনও ভাইরাসের মতোই ডেঙ্গু মানবদেহে চিরকাল সুপ্ত অবস্থায় থাকে, এ কারণেই এটি এত বিপজ্জনক। বর্তমানে ডেঙ্গু ভাইরাসের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট ভ্যাকসিন নেই।



মূল তথ্যঃ

• ডেঙ্গু একটি মশাবাহিত ভাইরাল সংক্রমণ।

• প্রতিটি স্ত্রী এডিস মশাই ডেঙ্গু ভাইরাস বাহক নয়। শুধু জীবাণুবাহী এডিস মশাই ডেঙ্গু ভাইরাস বহন করে।

• জন্মের পর সাধারণত পাঁচ দিনের মতো সময় লাগে একটা এডিস মশা পরিপূর্ণ হতে। এরপর তার ডিম পাড়ে। ৭ থেকে ১০ দিনের মতো তারা বেঁচে থাকে। এই সময়ের মধ্যে স্ত্রী প্রজাতির ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত মশা কামড়ালে ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয়া হবার আশংকা থাকে।

• সংক্রমণ ফ্লুর মতো অসুস্থতা সৃষ্টি করে এবং মাঝে মাঝে 'ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার,, 'ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম' নামক মারাত্মক জটিল শারীরিক অবস্থার সৃষ্টি করে।

• সাম্প্রতিক দশকগুলিতে ডেঙ্গুর বৈশ্বিক ঘটনা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা এখন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

• ডেঙ্গু বিশ্বব্যাপী গ্রীষ্মমন্ডলীয় এবং উপ-ক্রান্তীয় জলবায়ুতে পাওয়া যায়, বেশিরভাগ শহুরে এবং আধা-শহুরে অঞ্চলে।

• গুরুতর অসুস্থতা এবং কিছু এশীয় এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ মারাত্মক ডেঙ্গু।

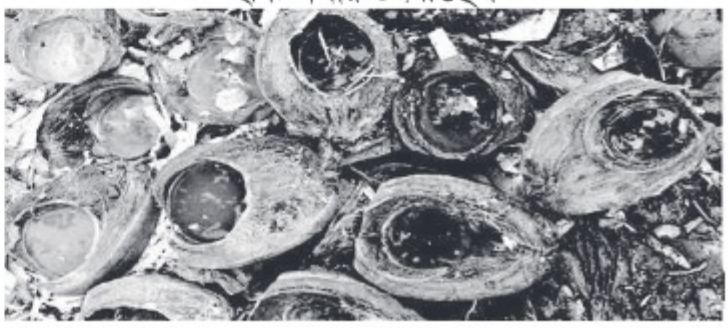
• ডেঙ্গু / মারাত্মক ডেঙ্গুর জন্য সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই, তবে প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং সঠিক চিকিৎসা ও যত্নের ফলে মৃত্যুর হার ১% এর চেয়ে কম হয়।

• সংক্রমণকারী জীবাণুর ধরন নির্ধারণ করে যে জ্বর কতক্ষণ স্থায়ী হয় এবং তার চিকিৎসা কিরূপ হওয়া উচিৎ। ভাইরাসজনিত জ্বর কমপক্ষে দুই থেকে তিন দিনের জন্য এবং কখনও কখনও এক থেকে দু'সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা না করানো পর্যন্ত সাধারণত সেরে উঠতে চায় না।

• ডেঙ্গু প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ 'কার্যকর ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।



ছবি: মশার উৎপত্তিস্থল



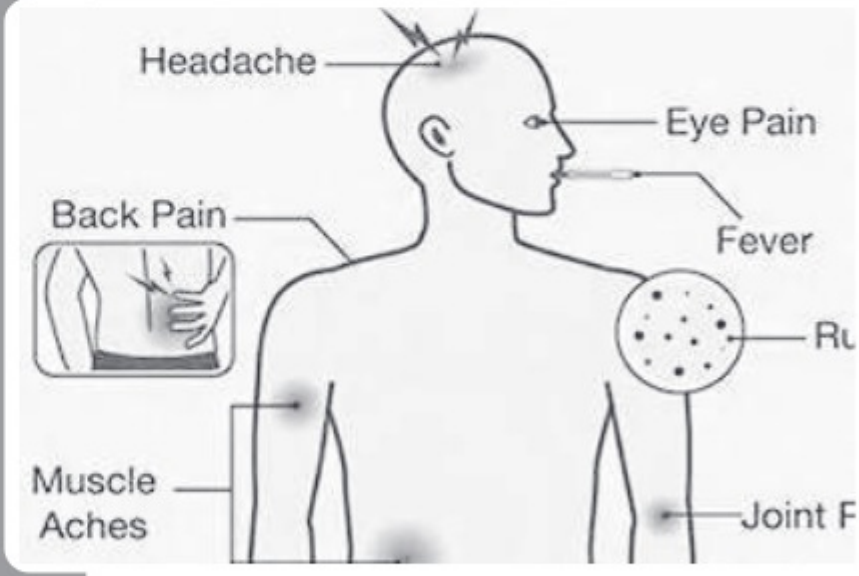
ডেঙ্গু জ্বর

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডেঙ্গুকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে।
সে অনুযায়ী ডেঙ্গু তিন প্রকারঃ
১. সতর্কসংকেতহীন ডেঙ্গু
২. সতর্কসংকেতসহ ডেঙ্গু এবং
৩. মারাত্মক বা সিভিয়ার ডেঙ্গু।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হন (৮০%), তাদের কোন সতর্ক সংকেত বা গুরুতর লক্ষণ প্রকাশ পায় না বা কেবলমাত্র হালকা কিছু লক্ষণ দেখা দেয় (প্রাথমিক জ্বরের মতো)। প্রায় ৫% ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি মারাত্মক বা সিভিয়ার ডেঙ্গুতে ভুগেন।

ডেঙ্গু জ্বরের সাধারণ লক্ষণসমূহঃ

- উচ্চমাত্রায় জ্বর (সাধারণত ১০২-১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে)
- প্রচন্ড মাথাব্যথা,
- চোখের ভিতরে ব্যথা,
- গুরুতর জয়েন্ট বা গিড়া এবং পেশী ব্যথা।
- লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া
- ত্বকের ফুসকুড়ি (প্রাথমিক জ্বর হওয়ার দুই থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে দেখা দেয়)
- বমি বমিভাব।
- নাক বা মাড়ি থেকে হালকা রক্তপাত।



ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে গুরুতর জয়েন্ট এবং পেশী ব্যথা, লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, মাথাব্যথা, জ্বর, ক্লান্তি এবং ফুসকুড়ি। জ্বর, ফুসকুড়ি এবং মাথাব্যথার উপস্থিতি হলো ডেঙ্গুর প্রতীকী লক্ষণ, এদেরকে "ডেঙ্গু ট্রায়েড" নামে অভিহিত করা হয়। তবে সবক্ষেত্রে যে এই তিনটি লক্ষণ একসাথে উপস্থিত থাকবে এমনটি আবশ্যকীয় নয়।



ডেঙ্গু জ্বরের সাধারণ লক্ষণগুলোর সাথে কাশি, ঠান্ডা লাগা ইত্যাদি ফ্লু এর মতো লক্ষণও থাকতে পারে। প্রাথমিকভাবে জ্বর আসার ২ থেকে ৫ দিন পর চামড়ার সমতলে লাল ফুসকুড়ি দেখা যেতে পারে। এ রোগের শেষের দিকেও র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি হতে পারে যা দেখতে অনেকটা হামের মতো।

বমি মানুষের একটা প্রটেক্টিভ ম্যাকানিজম। কারো দেহে যখন একটা রোগ প্রবেশ করে, তখন সেখানে কতগুলো নন-স্পেসিফিক সিম্পটম হয়। কারোর বমি, মাথা ব্যথা, মাংসপেশির ব্যথা, চামড়ায় অস্বস্তি হতে পারে, ক্ষুধামন্দা হতে পারে-এসবই নন-স্পেসিফিক সিম্পটম। এগুলোর জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করা যেতে পারে।

ডেঙ্গুতে চোখের সমস্যাঃ





ডেঙ্গু জ্বরে চোখের বিভিন সমস্যা দেখা যেতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে চোখের জটিলতা দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। এমনকি দৃষ্টিশক্তিও কমে যেতে পারে। ডেঙ্গুজ্বরে চোখের বিভিন সমস্যা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলোঃ

চোখে ব্যথা, চোখ লালঃ এটি সচরাচর অনেক ডেঙ্গু রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। অনেক সময় চোখে ঝাপসা দেখা, চোখের পিছনে ব্যথা হওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। এটি ২/ ৩ দিনের মাথায় নিজ থেকেই সেরে যায়।

চোখের ভিতর রক্তক্ষরণ

ডেঙ্গু জ্বরের একটি জটিলতা হলো রক্তের প্লাটিলেট কমে দেহে বিভিন্ন স্থানে রক্তক্ষরণ হতে পারে। চোখের ভিতর বা রেটিনায় ও এই রক্তক্ষরণ দেখা যায় অনেক সময়। জ্বরের ৫-৭ দিনের মাথায় এটি হবার আশংকা বেশি। সাধারণভাবে এটি বোঝা যায় না। তবে চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করে এটি নির্ণয় করতে পারেন।

ম্যাকুলোপ্যাথিঃ

রেটিনার কেন্দ্রীয় এলাকা ম্যাকুলা নামে পরিচিত। এটি চোখের বেশ স্পর্শকাতর অংশ। ডেঙ্গু জ্বরে চোখের এই বিশেষ অংশে ভাইরাস দ্বারা ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ হলে দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা হতে পারে। একে ম্যাকুলোপ্যাথি বলে। এটি অনেক সময় নিজে থেকেই সেরে যায়, কোন সময় ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ নেয়া লাগতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বরের গুরুতর রূপঃ

ডেঙ্গু জ্বরের গুরুতর রূপ দুইটা হলোঃ ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর (ডিএইচএফ) এবং ডেঙ্গু শক সিনড্রোম (ডিএসএস)।

তীব্র পেটে ব্যথা, ক্রমাগত বমি, মাড়ির রক্তপাত, বমি বমি ভাব ও ঘন ঘন শ্বাস নেওয়া, এবং অস্বাভাবিক ক্লান্তি বা অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রাথমিক লক্ষণের ৩-৪ দিন পরে দেখা দিলে তা গুরুতর ডেঙ্গু রোগ বা সংকটপূর্ণ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

ডেঙ্গুর সতর্ক সংকেত বা গুরুতর রোগ পূর্বক লক্ষণসমূহঃ

- ২-৩ দিন পরে জ্বর সেরে যাবার সময় রোগীর সার্বিক অবস্থার তেমন উন্নতি বা পরিস্থিতির কোন অবনতি ঘটেনি অর্থাৎ একই রকম অসুস্থতাবোধ করলে।
- অনবরত বমি বমি ভাব।
- প্রচন্ড পেটে ব্যথা,
- অস্থিরতা, হঠাৎ আচরণগত পরিবর্তন।
- রক্তক্ষরণ: নাক দিয়ে রক্তপাত, কালো পাতলা পায়খানা, হিমাটেমিসিস বা বমির সাথে রক্তপাত, মাসিকে অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, গাঢ় বর্ণের প্রস্রাব (হিমোগ্লোবিনইউরিয়া) বা প্রস্রাবের সাথে রক্তপাত (হেমাচুরিয়া)।
- হঠাৎ মাথা-ঘোরা।
- হাত-পা ফ্যাকাশে ও ঠান্ডা হয়ে আসা।
- প্রস্রাব কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া।
- আল্ট্রাসনোগ্রামে লিভারের আকার (> ২ সেমি) বেড়ে যাওয়া
- রক্তে হেমাটোক্রিট (২০%) বৃদ্ধি পাওয়া।

ADEM (অ্যাডেম) বা ডেঙ্গু বাহিত মস্তিষ্কের সংক্রমণ রোগ সাধারণত অটোইমিউন ডিজিজ (autoimmune) বা শরীরের প্রতিরক্ষাকারী কোষসমূহের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে হয়ে থাকে। মেরুরজ্জু বা স্পাইনাল কর্ডেও সংক্রমণ হতে পারে, যার ফলে শরীরের নিচের অংশ অবশ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ডেঙ্গু সংক্রমণটি প্রথমটির চেয়ে আরও মারাত্মক রূপে দেখা দেয়। Halstead এর মতে, যখন কোনও ব্যক্তি দ্বিতীয়বার ভিন্ন কোন ডেঙ্গু সেরোটাইপে সংক্রমিত হয়, তখন প্রথমবার সংক্রমণ থেকে তৈরী হওয়া অ্যান্টিবডিগুলো ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়াতে সহায়তা করে এবং রক্তে ভাইরাসের পরিমাণ বাড়ায়।

সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) সাবেক পরিচালক ও বর্তমানে আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) পরামর্শক অধ্যাপক ডাঃ মাহামুদুর রহমান বলেন, ডেঙ্গুর কারণে মায়োকার্ডাইটিসে (হার্টের পেশীতে প্রদাহ) আক্রান্ত হলে তা খুবই বিপজ্জনক। অনেক চিকিৎসকের পক্ষে তা দ্রুত বুঝে ওঠা কঠিন। তাই এ বিষয়ে চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। তিনি জানান, চীনে মায়োকার্ডাইটিসে আক্রান্ত তিন হাজার মানুষের ওপর গবেষণার ফলে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে ১১ শতাংশ ডেঙ্গু থেকে মায়োকার্ডাইটিসে আক্রান্ত হয়েছে। এটি আক্রান্তদের মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম।

একটি মশার কামড় মানুষের শরীরে ভাইরাস সংক্রমণ করার পরে সংক্রমণের লক্ষণগুলি সাধারণত প্রায় ৪ থেকে ১৫ দিন (ইনকিউবেশন পিরিয়ড সাধারণত চার থেকে সাত দিন পর্যন্ত) শুরু হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই রোগটি প্রায় তিন থেকে দশ দিন স্থায়ী হয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

এডিস মশার সাথে কিউলেক্স ও অ্যানোফিলিস মশার পার্থক্য হলো, কিউলেক্স ও অ্যানোফিলিস মশা একবার কামড়িয়েই রক্ত শুষে নেয়, কিন্তু এডিস মশা চার পাচজন মানুষের দেহ থেকে একটু একটু করে রক্ত শুষে নেয়। সেই রক্ত দেহের স্যালিভার গ্লান্ড বা লালা গ্রন্থির ভেতর পর্যন্ত যখন পৌছে, তখন সে ইনফেকটেড মশা বা জীবানুবাহিত মশায় পরিণত হয়। এই জীবানুবাহিত মশা যখন মানুষের দেহ থেকে রক্ত নেয়, তখন সে একটা ফ্লুইড ছাড়ে, যাতে রক্তটা জমে না যায়। তখন রক্তে ভাইরাস সংক্রমিত হয়ে মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়।

যারা পুনরায় সংক্রমণের শিকার হন তাদের মধ্যে এটি আরও মারাত্মক হয়। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ এবং লিভার ও অন্যান্য অর্গানের ক্ষতি হয়।

ডেঙ্গু নির্ধারণী পরীক্ষা

চিকিৎসকরা শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে ডেঙ্গু সংক্রমণের জন্য ভাইরাস বা এটির অ্যান্টিবডিগুলো নির্ণয় করার মাধ্যমে রোগ ধরতে পারেন।

সরকার এখন দেশব্যাপী ডেঙ্গু শনাক্তকারী টেস্টের ফি নির্ধারন করে দিয়েছে।

ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীর প্রথম ১-৩ দিনের মধ্যে NS1 antigen নির্ণয় করা যায়। NS1 antigen না থাকলে তার অর্থ ডেঙ্গুর acute- phase infection বা প্রাথমিক যে তীব্র সংক্রমণ, সেটি নেই। তবে রক্তে antidengue igM anti Dengue igG নির্ণয় করার মাধ্যমে শরীরে ডেঙ্গুর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়। সাধারণত টেস্টের ফলাফল পেতে ৪ দিন থেকে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) এর মতে। রক্তের মলিকিউলার টেস্টসমূহ (যেমন NS1 antigen, antidengue igM ইত্যাদি) অসুস্থতার ৭ দিন পরে ডেঙ্গু ভাইরাস সনাক্ত করতে পারে না। জ্বরের তিন দিনের মধ্যে এনএস-১ পরীক্ষায় ডেঙ্গু থাকলে তা পজিটিভ আসবে। এরপর আর এনএস-১ পরীক্ষা করে কোনো লাভ হবে না। ফল নেগেটিভ আসবে। আবার কোনো না কোনো কারণে এনএস-১ নেগেটিভ হলেও রোগের উপসর্গ থেকে যায়। ফলে উপসর্গ বহাল থাকলে এনএস-১ নেগেটিভ হলেও নিশ্চিন্তে বসে না থেকে সিবিসি করাতে হবে। আর পাঁচ-ছয় দিন পরে আইজি-জি-আইজিএম করালে যদি ডেঙ্গু থেকে থাকে তবে তা ধরা পড়বে। এ ক্ষেত্রে এনএস-১ নেগেটিভ হলেও রোগীর গায়ে ব্যথা, মাথাব্যথা, বমি, রক্ত আসা, শরীর দুর্বল থাকা, গায়ে র‍্যাশ ওঠার মতো উপসর্গ থাকলে সিবিসি-আইজিএম করা জরুরি। আইজিজি পজিটিভ হলে আমরা যেমন বুঝতে পারি, রোগীর আগে কোনো একসময় ডেঙ্গু হয়েছিল, আবার আইজিএম পজিটিভ থেকে বুঝতে পারি রোগী রিসেন্ট ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এরূপ হলে এন.এস. ১ নেগেটিভ হলেও তার ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা চলবে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয়টি হলো রোগীর প্লাটিলেটের রিপোর্টটি। এটা যদি ১ লাখের নিচে থাকে, তাহলে বিশেষ নজর দিতে হবে। এবছর দেখা গেছে যে, এন.এস.১ পজিটিভ না, কিন্তু রক্ত পরীক্ষায় প্লাটিলেট কম দেখা যাচ্ছে; এটা খুবই আশংকার কথা। এনএস-১ কিংবা আইজিএম নেগেটিভ হলে আর সিবিসিতে প্লাটিলেট স্বাভাবিক থাকলে আইজিজি পজিটিভ হলেও চিন্তার কিছু নেই। কারণ আগে কখনো ডেঙ্গু থাকলেও এখন রিসেন্ট তার ডেঙ্গু নেই বলেই ধরা হবে। তখন রোগীর উপসর্গ থাকলেও সেটা হয়তো অন্য কোনো কারণে হতে পারে। ডেঙ্গু অ্যান্টিবডির পরীক্ষা পাঁচ থেকে ছয় দিন পর করা যেতে পারে। এটি রোগ শনাক্তকরণে সাহায্য করে। যেহেতু রোগের চিকিৎসায় এর কোনো ভূমিকা নেই, তাই এই পরীক্ষা না করলেও কোনো সমস্যা নেই।

প্রয়োজনে ব্লাড সুগার, লিভারের পরীক্ষা, যেমন: এসজিওটি, এসজিপিটি, এলকালাইন ফসফাটেজ ইত্যাদি করাতে হতে পারে। আবার চিকিৎসক যদি মনে করেন, রোগী ডিআইসি জাতীয় জটিল কোনো সমস্যায় আক্রান্ত, সে ক্ষেত্রে প্রোথ্রোম্বিন টাইম, এপিটিটি, ডি- ডাইমার ইত্যাদি পরীক্ষা করাতে হতে পারে।

এছাড়াও রুটিন ব্লাড টেস্ট এবং লক্ষণ অনুযায়ী রোগীদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করানোর ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন ডাক্তারগণ।



Tourniquet Test:

অনেক সময় চিকিৎসকরা টরনিকেট টেস্ট (Tourniquet test) নামক একটি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে শরীরে ভিতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কিনা তা বুঝতে পারেন। সেক্ষেত্রে তারা গুরুতর ডেঙ্গু রোগ বা ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারের আগাম লক্ষণ বুঝতে পারেন। এই পরীক্ষায় একটি প্রেসার মাপার যন্ত্রের কাফ (cuff) নিয়ে বাহুতে বাধা হয় এবং প্রেশার মাপার মতো করে ফুলানো হয় সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক প্রেশারের মাঝামাঝি পর্যায়ে এবং ৫ মিনিট রাখা হয়। ডেঙ্গু রোগীর শরীরে হেমোলাইসিস বা অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরন থাকলে তখন রোগীর চামড়ার নিচের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালী থেকে রক্ত বের হয়ে আসে এবং লাল স্পট তৈরী করে যেগুলোকে petechie বলা হয়। শরীরের প্রতি ১ (ইঞ্চি)^2 জায়গা জুড়ে ১০ টির বেশি petechie দেখা দিলে তখন টরনিকেট টেস্ট পজিটিভ হয়; তখন ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরের সমুহ সম্ভাবনা আছে বলে চিকিৎসকরা ধরে নেন।

ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা

ডেঙ্গু চিকিৎসায় নতুন গাইডলাইন তৈরী করেছে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ। ডেঙ্গুর ধরন এবং প্রাথমিক আলামতের পরিবর্তন ঘটায় চিকিৎসা গাইডলাইন বা প্রটোকলে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ডেঙ্গু রোগীকে কোন অবস্থাতেই নতুন প্রটোকলের (যা জাতীয় গাইডলাইন ২০১৮ হিসেবে পরিচিত) বাইরে অন্য কোন চিকিৎসা দেয়া যাবে না।

ডেঙ্গু চিকিৎসা সুবিধার জন্য গাইডলাইনে ডেঙ্গু রোগীদের তিনটি ভাগে বা গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে, যারা যথাক্রমে গ্রুপ এ, গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি তে বিভক্ত। গ্রুপ এঃ ডেঙ্গু সাধারণ লক্ষন এবং কোন সতর্ককারী সংকেত নেই। এই গ্রুপের রোগীদের বাসায় চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দান করা হয়েছে।

গ্রুপ বিঃ ডেঙ্গু সাধারণ লক্ষণের পাশাপাশি ডেঙ্গু সতর্ককারী লক্ষণসমূহ ও বিদ্যমান। এদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরামর্শ দান করা হয়েছে।

গ্রুপ সিঃ ডেঙ্গু গুরুতর রূপ (হেমোরেজিক ফিভার/শক সিন্ড্রোম)। জরুরী ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসার প্রয়োজন।

ডেঙ্গু সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট কোন ওষুধ নেই। জ্বর হতে পারে তবে প্যারাসিটামল দিয়ে ব্যথা উপশম করা উচিত এবং এসপিরিনযুক্ত ঔষধগুলি এড়ানো উচিত যা রক্তক্ষরণ করতে পারে। বিশ্রাম নেওয়া, প্রচুর পরিমাণে তরল পান করা এবং ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত।



জ্বর কমানোর জন্য বারবার শরীর মুছে দিতে হবে। জ্বরে পানিশূন্যতা দেখা দেয়। তাই প্রচুর পানি ও তরল জাতীয় খাবার, যেমন: ফলের জুস, শরবত ইত্যাদি পান করতে হবে। বমির কারণে যদি কোনো রোগী পানি পান করতে না পারেন, সে ক্ষেত্রে শিরাপথে স্যালাইন দিতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যাসপিরিন বা অন্য কোনো ব্যথানাশক ওষুধ একেবারেই সেবন করা যাবে না। সাধারণত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত সব রোগীকেই রক্ত দেয়ার প্রয়োজন হয় না। রক্তের প্লাটিলেটের পরিমাণ কমে গেলে জরুরি ভিত্তিতে প্লাটিলেট দিতে হবে। আপনি যদি অসুস্থতা বোধ করেন এবং মনে করেন আপনার ডেঙ্গু হতে পারে:

১. প্যারাসিটামল (অ্যাসিটামিনোফেন) জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করতে পারেন। অ্যাসপিরিন বা আইবুপ্রোফেন বা অন্যান্য ঘঝঅওউ জাতীয় গ্রহণ করবেন না, কারণ এটি রক্তপাতের প্রবণতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

২. পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন এবং প্রচুর পরিমাণে তরল পান করুন।

৩. যতদূর সম্ভব, মশার কামড় ঠেকিয়ে রোগ ছড়ানো এড়ানো উচিত।

৪. শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আপনার শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে বেশি বেশি জল পান করুন। হাইড্রেটেড থাকলে মাথাব্যথার পাশাপাশি মাংশপেশির টান কম অনুভূত হয় এবং শরীর থেকে টক্সিন দূর হয়। আপনার যখন ডেঙ্গু জ্বর হয়, তখন আপনার শরীরের টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থগুলো ভাইরাস জীবাণুর প্রভাবকে আরো প্রকট বা তীব্র করে তোলে, যা শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে আনে।

৫. যদি শরীরের তাপমাত্রা 100.4° F (38° C) বা তার বেশি হয়, তখন সেটি জ্বরের লক্ষণ। এ সময় বিছানায় শুয়ে থাকুন এবং বিশ্রাম নিন।

৬. শরীরে তাপমাত্রা যখন বেশি থাকে তখন ঠান্ডা জল ব্যবহার বেশ উপকারী। জ্বরের সময় পানির সাথে লেবু এবং সামান্য সামুদ্রিক লবণ যোগ করার মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়া ইলেক্ট্রোলাইটস বা প্রয়োজনীয় লবণ-এর ঘাটতি পুরণ হতে পারে।

৭. চোখের সমস্যায় করনীয়ঃ জ্বরের প্রথম দিকে চোখ ব্যথা, লাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে। এর জন্য ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল খেলেই হবে। প্রচুর পানি আর তরল গ্রহণ করতে হবে। যদি ৪-৫ দিন পরেও চোখের ব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা না কমে তাহলে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিৎ। প্রত্যেক ডেঙ্গু রোগীর, বিশেষ করে যাদের প্লাটিলেট কমছে, জ্বরের ৭ দিনের মাথায় চোখ পরীক্ষা করানো দরকার এবং বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নেয়া উচিৎ।

ডেঙ্গু জ্বরের সময় করণীয়

জ্বর এলে পর্যাপ্ত পানি পান করুন, শরীর স্পঞ্জ করুন, বিশ্রাম নিন এবং মাথায় পানি দিন। জ্বর কমাতে প্যারাসিটামল সেবন করতে পারেন। আর কোনো ওষুধের দরকার নেই।

জ্বর প্রথম দিন থেকেই জটিল আকার মনে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নয়তো বাড়িতে তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন। তিন দিনে জ্বর না কমলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। নিজে দোকান থেকে কিনে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাবেন না, হিতে বিপরীত হতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বরে রক্তের অনুচক্রিকার মাত্রা বিপজ্জনক হারে কমে যেতে দেখা যাচ্ছে এবার। এটি ডেঙ্গু জ্বরের একটি জটিলতা। অনুচক্রিকা কমে গেলে দাঁত, ত্বকের নিচ, নাক ইত্যাদি স্থানে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়ে।

কখনো আরও মারাত্মক রক্তপাতও হতে পারে। কিন্তু ডেঙ্গু জ্বর হলেই বা অনুচক্রিকা কমে গেলেই রোগীকে রক্ত বা প্লাটিলেট দেওয়ার প্রয়োজন হয় এমন ধারণার ভিত্তি নেই। ডেঙ্গু হলে হাসপাতালে ভর্তি করে শিরায় স্যালাইন দিতেই হবে এ ধারণাও ভুল। রোগীর অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নেবেন। একেকজনের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে।

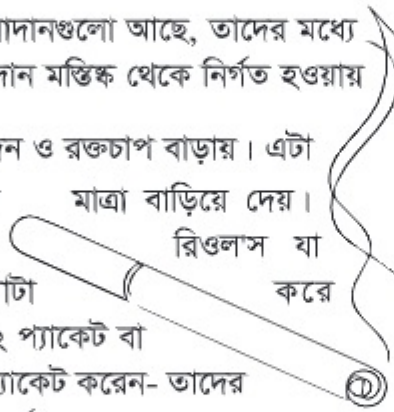
ধূমপান ও হৃদরোগ



বছরের পর বছর ধরে ধূমপান একটি জনপ্রিয় নেশা হিসেবে চলে আসছে। অনেকেই ভাবেন ধূমপান করলে তাকে অত্যন্ত স্মার্ট দেখায়। আবার কেউ ভাবেন ধুমপান না করলে মাথার মধ্য থেকে অদ্ভুত বুদ্ধি সম্পন্ন চিন্তাগুলো বের হয় না। অনেকেই ধূমপান করলে শিথিলতা অনুভব করেন, তবে এটা খুবই সাময়িক। অনেকে আবার মনে করেন ধূমপান না করলে জীবনের অনেক কিছুই অপূর্ণ থেকে যায়। বিশেষ করে আজকাল তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বদ অভ্যাসটি ছড়িয়ে পড়ছে। আগে লোকে মনে করত ধূমপানের সঙ্গে ফুসফুসের ক্যান্সার ও ফুসফুসের অন্যান্য রোগই শুধু হয়। কিন্তু এটি শেষ গল্প নয়। বর্তমান বিশ্বে ধূমপানকে হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। আমাদের দেশে কতজন লোক ধূমপানের জন্য মৃত্যুবরণ করছে, তবে সঠিক হিসাব দেয়া মুশকিল এবং আমেরিকায় দেখা যায়, বছরে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার লোকের মৃত্যুর জন্য ধূমপান কোন না কোনভাবে দায়ী। এই মৃত্যুর প্রধান কারণ হার্ট অ্যাটাক। অতএব সহজেই অনুমেয় যে, ধূমপান হৃদরোগের জন্য কত বড় হুমকিস্বরূপ। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, একজন ২৫ বছর বয়স্ক লোক, যিনি সারাদিনে ২০টি সিগারেট পান করেন, তার জীবন আয়ু যারা ধূমপান করেন না তাদের থেকে ৮/১০ বছর কম হয়। সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে যতজন লোক হার্ট অ্যাটাক নিয়ে জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে ৭০/৮০ ভাগ লোকই ধুমপায়ী।

ধূমপান কেন এত ক্ষতিকর?

সিগারেটের মধ্যে যে ক্ষতিকর উপাদানগুলো আছে, তাদের মধ্যে নিকোটিন ও কার্বন মনোক্সাইড অন্যতম। নিকোটিন অ্যাড-রিনালিনের মত এক ধরনের উপাদান মস্তিষ্ক থেকে নির্গত হওয়ায় সাহায্য করে।



আর এই অ্যাডরিনালিনই হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ বাড়ায়। এটা ফ্যাট সেল থেকে ফ্যাটি এসিড নামক এক ধরনের পদার্থ বের করে রক্তে কোলস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ধূমপান আরও যেটা করে তা হচ্ছে, মাইওকারডিয়াল (হার্টের মাংসপেশী) আরটে- সূক্ষ্ম রক্তনালীতে হায়ালিন জাতীয় পদার্থ জমা করে, রিওল'স যা রক্তনালীর দেয়ালের আবরণকে মোটা করে দেয় (Hyaline thickening) গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ধূমপান করেন দিনে ২ প্যাকেট বা তারও বেশি-তাদের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখা যায় ৯০.৭% ক্ষেত্রে। আবার যারা ১ প্যাকেট করেন- তাদের মধ্যে ৪৮.৪% ক্ষেত্রে এবং যারা ধূমপান করেন না তাদের কারো রক্তনালীতে এ ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় না। এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে মাংসপেশী রক্ত স্বল্পতায় ভোগে এবং ব্যক্তিটি বুকে ব্যাথা অনুভব করেন। এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়, ধূমপান মহাধমনী হতে শুরু করে সূক্ষ্ণ রক্তনালী পর্যন্ত সব জায়গায় তার বিষাক্ত থাবা বসায়।

ধূমপানের ক্ষতিকর উপাদান:

(১) কার্বন মনোক্সাইড:

(ক) উচ্চ মাত্রায় কারবোক্সি হিমোগোবিন তৈরি করে-অক্সিজেনের পারসিয়াল প্রেসার কমিয়ে দেয়। বিশেষ করে যখন ইস্কোমিক হার্ট ডিজিজ থাকে।

(খ) হিমোগোবিনের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, ফলে রক্তনালীর দেওয়ালের ভেতরের আবরণ রক্ত স্বল্পতায় ভোগে এবং সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কারণ কার্বন মনোক্সাইডের হিমোগে-াবিনকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা অক্সিজেনের চাইতে প্রায় ২০০ গুণ বেশি। হিমোগে-াবিনের অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে হৃৎপিণ্ডসহ শরীরের প্রতিটি জায়গায় অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায়।

(গ) কার্বন মনোক্সাইড রক্তে চর্বি জাতীয় পদার্থকে খুব সহজেই রক্ত নালীর দেয়াে-লর পাতলা আবরণকে ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করে এবং রক্তনালীর গায়ে জমা হয়ে ওখানে এথেরোসক্লেরোসিস তৈরি করে।

(২) নিকোটিন:

(ক) শরীরের ক্যাটাকোলামাইন বেশি নিসৃত হতে সাহায্য করে স্নায়ুকে উদ্দীপিত ও উত্তেজিত করে এবং হার্ট বিট ও রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। ১টি সিগারেট পান কম পক্ষে হার্ট বিট মিনিটে ১০ বার বেশি করে ও রক্তচাপ ১০ মি.মি. বাড়িয়ে দেয়।

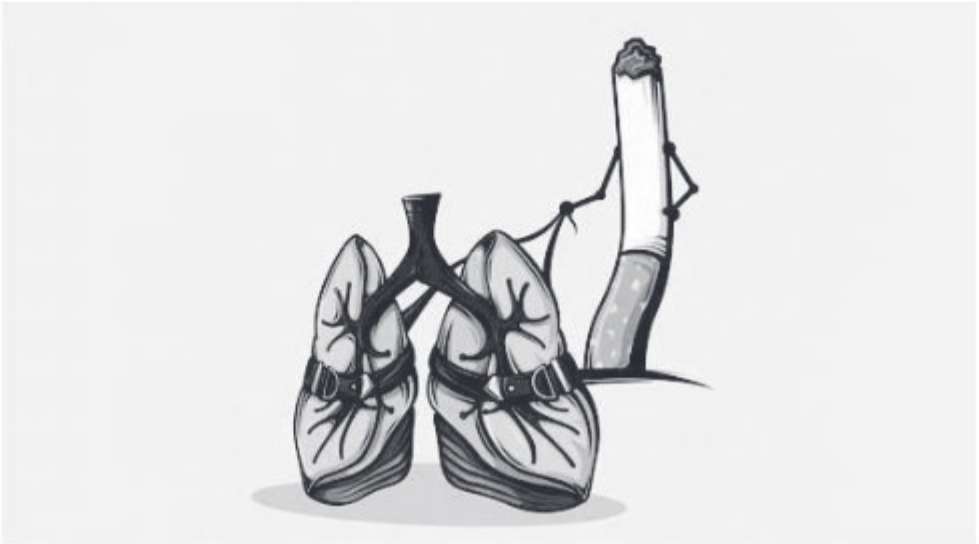


- কার্বন মনোক্সাইড অক্সিজেন সরবরাহ কমিয়ে দেয়।
- নিকোটিন অক্সিজেনের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়।

(খ) নিকোটিনের বিষাক্ত উপাদান রক্তনালীর দেওয়ালের এন্ডোথেলিয়াম কোষের ক্ষতি করে এবং এই কোষ হতে প্রোসটাগ- নিডিন নামক এক ধরনের পদার্থের নিসৃত হওয়াকে কমিয়ে দিয়ে (প্রোসটাগানডিন ধমনীকে প্রসারিত হতে সাহায্য করে) রক্তনালীকে প্রয়োজনের সময় প্রসারিত হতে দেয়

গ) ধূমপানের ধোয়ার বিষাক্ত পদার্থ চর্বি কোষ হতে ফ্যাটি এসিড নামক এক ধরনের পদার্থ বের করে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে এই কোলেস্টেরলগুলি রক্ত নালীর ভেতরের দেয়ালে জমা হয়ে এথেরোসক্লেরোসিস সৃষ্টি করে রক্তনালীর পথকে সরু করে দেয় এবং রক্তনালীর এই ধরনের ক্ষতি হার্টসহ হাতে-পায়ে অথবা শরীরের যে কোন জায়গায় হতে পারে। শুধু যে কোলেস্টেরল বাড়ে তাই নয় নিকোটিন রক্তে এইচ, ডি, এল (ভাল কোলেস্টরল) এর মাত্রা কমিয়ে দেয় ও এল, ডি এল (খারাপ কোলেস্টরল) এর মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। রক্তে একটি বিশেষ ধরনের কনিকা, "প্লাটিলেট বা অনুচ-ক্রিকাকে (যা রক্ত বাঁধার জন্য ব্যবহৃত হয়) আঠালো করে দেয় ও রক্তে ফিব্রিনে-জেনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। প্লাটিলেটও ফিব্রিনোজেন রক্তের এ দুটি উপাদানই ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধায় ব্যবহৃত হয়। এগুলি বেশি হওয়ার ফলে রক্তনালীতে রক্ত জমাট বেঁধে-সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালীকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে হার্ট অ্যাটাক ও পক্ষাঘাতের মত রোগের জন্য দেয়। এথেরোসক্লেরোসিস হওয়ার ফলে রক্তনা-লীর দেওয়ালের নমনীয়তা লোপ পায় এবং ধূমপানের সঙ্গে সঙ্গে রক্তচাপ বাড়তে থাকে। ক্রমান্বয়ে রক্তচাপ বাড়তে বাড়তে মানুষটি একদিন উচ্চ রক্তচাপের রোগি হয়ে যায়। উচ্চ রক্তচাপ হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীকে পুরু করে এবং আস্তে আস্তে হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যায়। হৃৎপিন্ডের কক্ষগুলিও প্রসারিত হয়ে যায়। উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা না করলে পরিণামে হার্ট ফেইলিওর নামক রোগের সৃষ্টি হয়। উচ্চ রক্তচাপ ইস্কোমিক হার্ট ডিজিজের একটি প্রধান ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান। তাছাড়া উচ্চ রক্তচাপ মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণ করে পঙ্গুত্ব ডেকে আনতে পারে। ধূমপান কিডনি ফেইলিওরসহ কিডনি ও মূত্রথলীর ক্যান্সার রোগের কারণ হতে পারে। ধূমপান হৃৎপিন্ডের কাজকে বাড়িয়ে দেয় এবং একই সঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ কমিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় হার্ট তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ পায়-না। ফলে বুকে ব্যাথা হতে পারে। হার্টের মাংসপেশীতে রক্ত সরবরাহের স্বল্পতার জন্য যে বুকের ব্যাথা হয় তাকে এনজিনা পেকটোরিস বলা হয়। কারো যদি এনজিনা নাও থাকে, ধূমপান এনজিনা হওয়ার সম্ভাবনাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। একবার এনজিনা শুরু হলে ধূমপান বন্ধ না করলে এনজিনা বেড়ে যাবে এবং কোন এক সময় হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে। যারা ধূমপান করেন-তাদের মধ্যে অনেকেরই উচ্চ রক্তচাপ ও বহুমূত্র রোগ থাকে। এই ৩টি ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান থাকার ফলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভবনা কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

ধূমপান রক্তের ধমনী ও শিরার রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। ধূমপান রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে হাত পায়ের বিশেষ করে পায়ের শিরাগুলোর মধ্যে আটকিয়ে রক্তের গতি প্রতিরোধ করে। ফলে রক্তের অভাবে হাত পায়ে পচন (গ্যাংগ্রিন) ধরে যেতে পারে। এমন অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে অপারেশন না করলে হাত পায়ে পচন রোধ করা সম্ভব হয় না। যাদের রক্তে কোলেস্টেরল বেশি আছে অথবা উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের ধূমপানে হৃদরোগের ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে যায়। যে যত বেশি সিগারেট পান করেন, তার হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা যে পান করেন না তার থেকে ২ গুণ বেশি। দৈনিক ১২ (বার) বা তার চেয়ে বেশি। আর হার্ট অ্যাটাক হলে ধূমপায়ীদের মৃত্যুর হার অধুমপায়ীদের চেয়ে বেশি এবং ২-৪ গুণ বেশি "হঠাৎ মৃত্যু'র আশংকা। ধূমপান আয়ু-কাল কমিয়ে দেয়। একবার হার্ট অ্যাটাকের পরে যদি কেউ ধূমপান বন্ধ না করেন তার আবার হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেক গুণ বেড়ে যায়।





পক্ষান্তরে দেখা যায় ধূমপান বন্ধ করার পর থেকেই ধূমপানের ভয়াবহ বিষক্রিয়া কমতে থাকে। শেষ ধূমপানের ২০ মিনিটের মধ্যে নিকোটিনের কারণে সংকোচিত রক্তনালীগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে থাকে, হার্ট বিট ও রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে আসে, হাত-পায়ের ঠাণ্ডাভাব কমে আসে যা কিনা অনেক ধূমপায়ীদের মধ্যে দেখা যায়। শেষ ধূমপানের ৮ (আট) ঘন্টার মধ্যে রক্তে অক্সিজেন মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং কার্বন মনোক্সাইড এর মাত্রা কমে যায়, ফলে হার্ট সহ শরীরের সমস্ত মাংসপেশী ও টিস্যু প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পেতে শুরু করে। আর তাই দেখা যায় ধূমপান বন্ধ করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে পূর্বধূমপায়ীরা ধূমপানের বিষক্রিয়ার হাত থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেন এবং পরবর্তী একবছরে তাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ধূমপায়ীদের তুলনায় অর্ধেক কমে আসে। পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে বর্তমান ধূমপায়ীদের তুলনায় তাদের হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা কমে ৫০%-৭০% ভাগ। ছয় থেকে দশ বছরের মধ্যে এই হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অধুমপায়ীদের (যারা জীবনে কোন সময়ই ধূমপান করেন নাই) মতই হয়ে যায় অর্থাৎ হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা একেবারেই কমে যায় মহিলা-পুরুষ সবার মধ্যেই। তবে একটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে, আপনি ধূমপান ত্যাগ করলেও যদি অন্য কেউ আপনার সম্মুখে ধূমপান করেন, তবে তার ক্ষতিকর প্রভাব আপনার। উপরও বিস্তার করবে। আর তাই ধূমপায়ীদের ধূমপানের সময় তাদের সামনে না থাকাই আপনার জন্য শ্রেয়। ধূমপান করলে মহিলাদেরও একই রকমের ক্ষতি হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতির আশংকা থাকে। যেসব মহিলারা ধূমপান করেন এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি খান তালের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাক ও পক্ষাঘাতের সম্ভবনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। গর্ভবতী। মহিলারা ধূমপান করলে গর্ভপাতসহ গর্ভের সন্তানটির অল্প ওজন ও ছোট আকারের ত্রুটিসহ জন্মগত হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ধূমপান সেই সব বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের হার বাড়িয়ে দেয়-যারা ইস্ট্রোয়েন রিপ্লেসমেন্ট চিকিৎসা গ্রহণ করেন।

অনেকে মনে করেন পাইপের মাধ্যমে তামাক সেবনের খুঁয়ায় হার্টের কোন ক্ষতি হয় না। আবার কেউ কেউ সিগারেট বন্ধ করে তামাক, জর্দা সেবন করেন অথবা গুল ব্যবহার করেন-সিগারেটে বন্ধ করে তামাক, জর্দ্য সেবন করেন অথবা গুল ব্যবহার করেন-সিগারেটের ধোঁয়ার বিষক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তবে এ কথাটুকু মনে রাখতে হবে নিকোটিন যা কিনা তামাকের পাতায় থাকে তা- যে ভাবেই গ্রহণ করা হোক না কেন, একইভাবে হার্ট ও রক্তনালীর জন্য ক্ষতিকারক। ধূমপান শুধু মাত্র হৃৎপিন্ডের রোগই যে বাড়িয়ে দেয় তা নয়, ধূমপান আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অংগ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি করে। পক্ষান্তরে ধূমপান যে আমাদের কোন উপকার করে এ রকম কোন উদাহরণ কারো পক্ষে দেখানো সম্ভব না।





ধূমপায়ীরা যদি ধূমপান ছেড়ে দেন তাহলে

১) ২০ মিনিট পরে–ব্লাড প্রেসার ও নাড়ির স্পন্দন স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসে।

২) ৮ ঘণ্টা পর রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা স্বাভাবিক আসে।

৩) ২৪ ঘণ্টা পর ফুসফুস পরিষ্কার হতে শুরু করে এবং কোন কার্বন–মনোক্সাইড শরীরে থাকে না।

৪) ৪৮ ঘণ্টার পর নিকোটিন শরীর থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। এর ফলে ব্যক্তিটির মুখের স্বাদ ও ঘ্রাণের শক্তি উন্নতি ঘটে।

৫) ৭২ ঘণ্টা পর শরীরের শারিরীক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও শ্বাসতন্ত্রের নালীগুলি আস্তে আস্তে প্রসারিত (জবসধী) হতে থাকে।

৬) ২ থেকে ১২ সপ্তাহের মধ্যে শরীরে রক্ত চলাচল উন্নতি লাভ করে এ সময় হাঁটাহাঁটি করা এবং দৌড়ানো অনেক সহজ হয়ে উঠে।

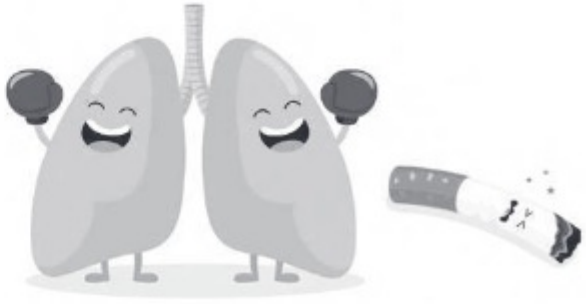
৭) ৩ থেকে ৯ মাসের মধ্যে ফুসফুসের কার্যক্রমের উন্নতি ঘটে ১০ ভাগ। কাঁশ এবং ফুসফুসের শাঁ শাঁ ভাগ অনেক কমে আসে।

৮)পাঁচ বৎসর পর ধূমপায়ীদের তুলনায় হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমে আসে অর্ধেকে

৯) ১০ বৎসর পর ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসে অর্ধেকে ধূমপায়ীদের তুলনায় এবং হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা ততটুকুই থাকে তাদের তুলনায় যারা কোন দিনই ধূমপান করেননি তাদের সমান।

নকোটিনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম সময় লাগতে পারে। তবে সাধারণত দু-চার সপ্তাহ লাগে। নেশা ছেড়ে দেওয়ার পর বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া যখন শুরু হবে, তখন সেগুলোকে নেশা থেকে মুক্তি পাওয়ার ও সুস্থতা অর্জনের পূর্বলক্ষণ হিসেবে ভাবতে চেষ্টা করুন। মনে করুন আপনার শরীর নিজে থেকেই নিজেকে পরিষ্কার করে নিচ্ছে।

দুই-চার সপ্তাহ পর শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলো থেকে মুক্তি পেলেও ধূমপানের প্রতি যে ব্যাগ্র কামনাটুকু বাকি থাকে, তার প্রায় পুরোটাই মানসিক ব্যাপার। তাই এ সময় মনটা শক্ত রেখে ধূমপানের সর্বনাশা ক্ষতির কথা ভেবে নিজেকে সংযত রাখুন। ধূমপান ছাড়তে ইচ্ছুক এমন আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিতে পারলে ভালো হয়। খেলাধুলা, ব্যায়াম ও আনন্দ-ফুর্তির মধ্য দিয়ে সময় কাটানোর চেষ্টা করতে হবে। পরিবারের লোকজন, বিশেষ করে স্ত্রী ও সন্তানেরা এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। যত তাড়াতাড়ি ধূমপান ছাড়া যায় ততই ভালো। অবসর সময়ে এমন কাজে ব্যস্ত থাকুন, যেন মন চাইলেও আপনার হাত সিগারেট ধরানোর সুযোগ না পায়। ধূমপানের বদলে ফলমূল, সবজির সালাদ, ফলের রস, চিনিমুক্ত চুইংগাম ও চকলেট খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন। এভাবে সংখ্যা কমাতে কমাতে সিগারেট একেবারে ছেড়ে দিন। ধূমপানমুক্ত নতুন সমাজ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখুন।





গলব্লাডার বা পিত্তথলির বিভিন্ন রোগ

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী অধ্যাপক,
হেপাটোবিলিয়ারী পেনক্রিয়াটিক সার্জারী বিভাগ
বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা।

গলব্লাডার বা পিত্তথলি লিভারের সাথে সংশ্লিষ্ট পিত্তরস সম্পর্কিত তন্ত্রের একটি অঙ্গ। দেখতে একটা ছোট্ট থলির মত। লিভারের ডানদিকের অংশের ঠিক নিচে এর অবস্থান। গলব্লাডার তার নিজস্বনালি বা সিস্টিকডাক্টের মাধ্যমে মূল পিত্তনালি বা বাইলডাক্টের সাথে সংযুক্ত।

লিভার থেকে নির্গত বাইল বা পিত্ত সাময়িকভাবে পিত্তথলিতে জমা থাকে। হজম ক্রিয়ার প্রয়োজন মত পিত্তথলির পিত্ত আবার পিত্তনালির মাধ্যমে খাদ্যনালিতে নির্গত হয়। গলব্লাডার পিত্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে এবং ইলেক্ট্রলাইটস এর পরিবর্তন করে। এই পিত্ত আমাদের হজমসহ খাদ্যনালির অন্যান্য কাজে সহায়তা করে থাকে।

এই গলব্লাডারের সাধারণ কয়েকটি অসুখের মধ্যে রয়েছে:

- গলব্লাডারের পাথর (Gall stone)
- গলব্লাডারে ইনফেকশন (Cholecystitis)
- গলব্লাডারে পুঁজ (Empyema)
- গলব্লাডারে কেলসিফিকেশন বা ক্যালসিয়াম জমা হওয়া (Porcelain Gall bladder)
- গলব্লাডার টিউমার (Gall bladder tumour)

গলব্লাডারে অসুখগুলোর একটা মারাত্মক দিক হচ্ছে এই অসুখের একটি বা একাধিক কিংবা সবগুলোই একজন মানুষের গলব্লাডারে থাকতে পারে। রোগের একাধিক উপস্থিতিতে জটিলতা যেমন বেশি হবে তেমনি চিকিৎসাও হয়ে উঠবে কষ্টসাধ্য।

গলব্লাডারের পাথর:

শরীরের যে সমস্ত অঙ্গের সাথে বিভিন্ন রসের প্রস্তুত এবং নির্গনের সম্পর্ক রয়েছে সেইসব অঙ্গে যে কোন সময় পাথরের সৃষ্টি হতে পারে। গলব্লাডার সে ধরণের অঙ্গের একটি।

গলব্লাডার পাথরের কারণ:

গলব্লাডার পাথরের সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনেকগুলো অবস্থা বা বিষয়কে এর জন্য দায়ী বলে বিবেচনা করা হয়। সেইসব বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. গলব্লাডারে অতিরিক্ত সময় পিত্ত জমে থাকা (Biliary stasis) গলব্লাডার বা পিত্তথলির পাথর সৃষ্টির জন্য বহুলাংশে দায়ী। গলব্লাডারের ছোটনালি, পেঁচানো সিস্টিক ডাক্ট, অস্বাভাবিক বাঘভ, গলব্লাডারের অস্বাভাবিক অবস্থান, পিত্ততন্ত্রের অস্বাভাবিক কার্যকলাপ, ঘনঘন গর্ভাবস্থা ইত্যাদি কারণে গলব্লাডারে পিত্ত দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করে।

২. গলব্লাডারের ইনফেকশন অনেক ক্ষেত্রে দায়ী পিত্তথলির পাথরের জন্য। লিভার, পিত্তনালি, খাদ্যনালির যে কোন ব্যাক্টেরিয়া অতিসহজে পিত্তথলিতে আসতে পারে। এই ব্যাক্টেরিয়া পাথর সৃষ্টির একটা কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করে এক বা একাধিক পাথরের সৃষ্টি করতে পারে।

৩. পিত্তরসের রাসায়নিক পরিবর্তন: পিত্তরস বা বাইলের মধ্যে বাইলসল্ট ও কোলেস্টেরল এর নির্দিষ্ট একটি পরিমাণে থাকে। এই পরিমানের পরিবর্তন হলেও পাথর হতে পারে।

গলব্লাডারে পাথরের উপসর্গঃ

পেটের ডান দিকের উপরিভাগে তীব্রব্যথা, ঐ ব্যথা পিঠের দিকেও ছড়িয়ে ডান কাঁধ পর্যন্ত আসতে পারে। এই ব্যথা হঠাৎ করে শুরু হয়ে কিছুক্ষণ পরে কমেও যেতে পারে অথবা সবসময় অল্পব্যথা অনুভব হতে পারে। বদহজম বা বমি বমিভাব হতে পারে। সাধারণত অল্পজ্বর হয়ে থাকে। বেশী জ্বর হলে মনে করতে হবে গলব্লাডারে পুঁজের সৃষ্টি হতে পারে, যাকে এম্পায়েমা গলব্লাডার বলা হয়ে থাকে।

অনেকক্ষেত্রেই গলব্লাডারের পাথর উপসর্গবিহীন থাকতে পারে। পেটের অন্য কোন উপসর্গ বা রোগ নির্ণয়ের জন্য আলট্রাসাউন্ড করলে তাতে গলব্লাডারে পাথর নির্ণয় করা যায়। শারীরিক পরীক্ষার সময় পেটের ডান দিকের উপরিভাগে রোগী

রোগ নির্ণয়ঃ

ব্যথা অনুভব করতে পারে। গলব্লাডার ফুলে গেলে তা উদর পরীক্ষার সময় হাতেও লাগতে পারে। কোন কোন সময় গলব্লাডার অন্যান্য অঙ্গের সাথে জড়িয়ে পেটের ডানদিকে একটা চাকার সৃষ্টি করতে পারে। আবার কোন সময় অল্প জন্ডিসও হতে পারে।

পেটের আলট্রাসনোগ্রাম একটি সহজ পরীক্ষা, যার মাধ্যমে গলব্লাডারের পাথরের অবস্থান, গলব্লাডারের দেয়ালের অবস্থা, গলব্লাডারের পুঁজ, কোন চাকা এবং টিউমার, পলিপ ইত্যাদি অতি সহজে নিরূপন করা যায়। সাধারণ রক্ত পরীক্ষাতেও গলব্লাডারের ইনফেকশন হয়েছে কিনা বোঝা যায়।

গলব্লাডারে পাথরের চিকিৎসা

গলব্লাডারের পাথর থেকে উপসর্গ দেখা দেয়ার সময় থেকেই তার সঠিক চিকিৎসা করতে হয়। পাথরসহ গলব্লাডার অপারেশন বা কলিসিস্টেকটমি করতে হয়।

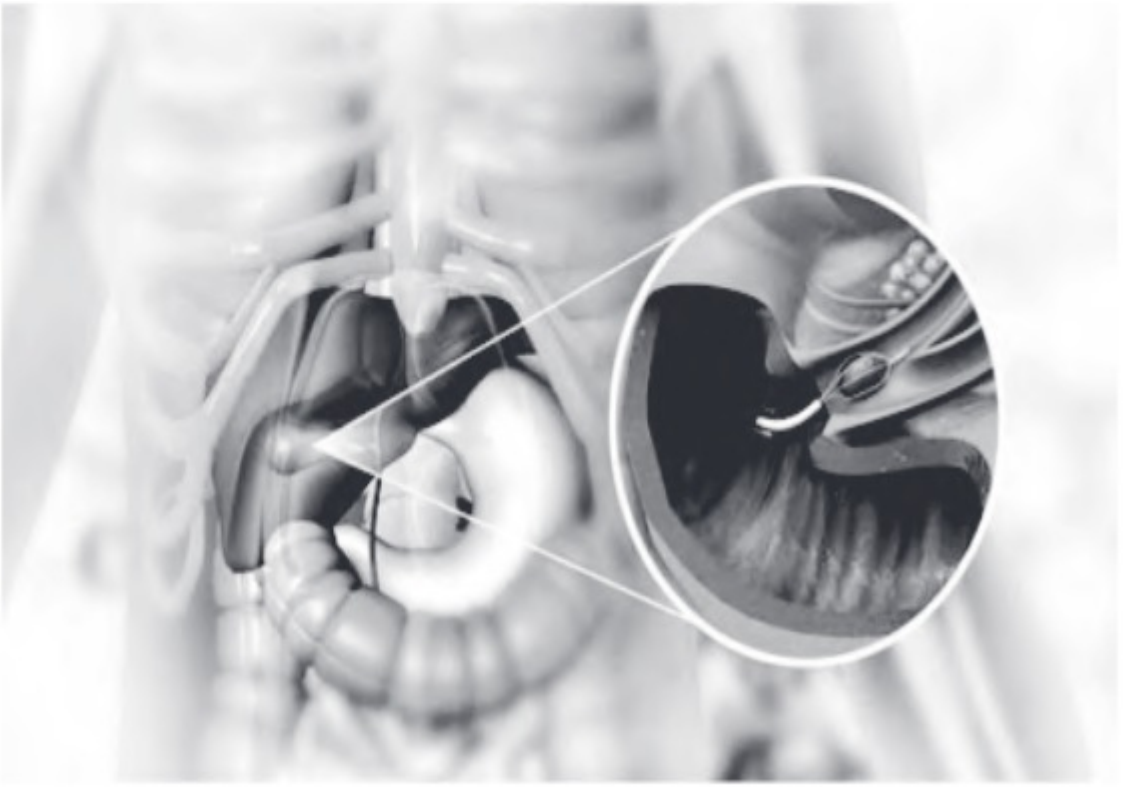
এই অপারেশন সাধারণত দুইভাবে করা যায়

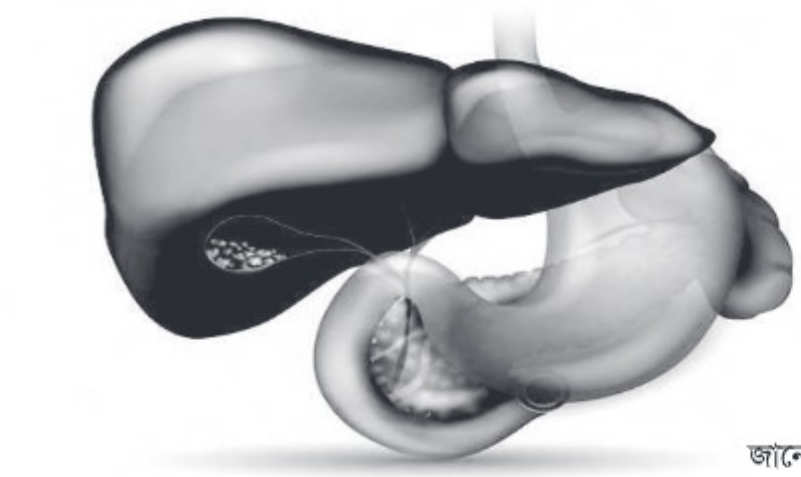
১. ল্যাপারোস্কপিক কলিসিস্টেকটমিঃ পেটের অপারেশন না করে ল্যাপারোস্কোপর মাধ্যমে গলব্লাডারসহ পাথর বের করা যায়। বর্তমানে এই পদ্ধতিই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। রোগী সাধারণতঃ দ্বিতীয় দিন বাড়ী চলে যেতে পারেন এবং তার দৈনন্দিন কাজকর্মে কোন অসুবিধা হয়না।

২. অপেন কলিসিস্টেকটমিঃ কোন কোন ক্ষেত্রে জটিল আকার ধারণ করলে, চাকার সৃষ্টি হলে, গলব্লাডারে অত্যদিক পুজ বা পচে গিয়ে গায়রিনের সৃষ্টি হলে অপারেশন এর মাধ্যমে গলব্লাডার সহ পাথর অপসারন করতে হয়।

পাথরসহ গলব্লাডার অপসারনের পর গলব্লাডারের হিস্টোপ্যাথলজি পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে যে এতে ইনফেকশন ছাড়া অন্য কোন অসুখ বা ক্যান্সার আছে কিনা। মনে রাখতে হবে গলব্লাডারের ক্যান্সারে প্রায় ৮০ভাগ ক্ষেত্রে পাথর থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় হিস্টোপ্যাথলজী পরীক্ষা না করানোতে ক্যান্সার অনির্ণীত রয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতে ক্যান্সার আস্তে আস্তে লিভার ও পিত্তনালীতে ছড়িয়ে গিয়ে কয়েক মাসের মধ্যে রোগীর পিত্তনালী বন্ধ করে বাধাজনিত জন্ডিস অথবা লিভারে মেটাস্টেটিক (পিত্তথলি থেকে ছড়ানো) টিউমারের সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থা এতটাই জটিল যে রোগীর জন্য আরোগ্যকারী লাভজনক তেমন কোন চিকিৎসাই করা যায়না। এই ব্যাপারে ডাক্তার অথবা রোগী কেউই অবহেলা করা উচিত নয়।





উপসর্গহীন গলব্লাডারের পাথর

উপসর্গহীন গলব্লাডারের পাথর:

অনেকক্ষেত্রেই পিতাথলি বা গলব্লাডারের পাথর উপসর্গবিহীন থাকতে পারে। পেটের অন্য কোন উপসর্গ বা রোগ নির্ণয়ের জন্য আলট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষা করলে তাতে গলব্লাডারে পাথর ধরা পড়ে।

গলব্লাডারের ভিতর সৃষ্টি পাথর একটি ফরেন বডি বাহ্যিক বস্তু হিসাবে কাজ করে। যা আস্তে আস্তে গলব্লাডারের ক্ষতি সাধন করে অবশেষে ইনফেকশন (কলিসিস্টাইটিস) করতে পারে। একটা পাথর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে অন্য আরও পাথরের সৃষ্টি করতে পারে। এই সমস্ত ক্রিয়াই নিরবে উপসর্গহীনভাবে গলব্লাডারে হতে পারে।

উপসর্গহীন গলব্লাডারের পাথরের চিকিৎসা:

উপসর্গহীন গলব্লাডারের পাথরের ক্ষেত্রে অপারেশন করতে হবে কিনা সেটা নিয়ে অনেক সময় মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। অপারেশন না করার যুক্তি হলো যেহেতু পাথর কোন উপসর্গ দিচ্ছেনা তাতে অহেতুক অপারেশন করব কেন। কিন্তু সবক্ষেত্রে এই ধারনা মোটেই ঠিক নয়।

গলব্লাডারের পাথর সম্পর্কিত কয়েকটি দিক :

১. গলব্লাডারের ভিতর সৃষ্টি পাথর একটি ফরেন বস্তি (Foreign bodz) হিসাবে কাজ করে। যা আস্তে আস্তে গলব্লাডারের ক্ষতি সাধন করে, ইনফেকশন (কলিসিস্টাইটিস) করতে পারে। একটা পাথর নিউক্লিয়াস হিসাবে কাজ করে অন্য আরও পাথরের সৃষ্টি করতে পারে। এই সমস্ত ক্রিয়াই নিরবে উপসর্গহীনভাবে গলব্লাডারে হতে পারে।

২. গলব্লাডারের পাথর যে কোন সময় পিত্তথলির নালী (Cstic duct) এর মাধ্যমে মূল পিত্তনালী বা বাইল ডাক্টে (Bile duct) গিয়ে পিত্তনালী সম্পূর্ন বা আংশিক বন্ধকরে বাধাজনিত জন্ডিসের সৃষ্টি করতে পারে। যা রুগীর জন্য এক জটিল অবস্থায় সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় পিত্তথলীর ও পিত্তনালীর চিকিৎসা অনেক শুন জটিল ও ব্যায়বহুল।

৩. পিত্তথলীর এই পাথর পিত্তনালীর শেষ অংশে পেনক্রিয়াস বা অগ্নাশয়ের নালীর মুখ বন্ধ করে পেনক্রিয়াসের ইনফেকশন বা পেনক্রিয়াটাইটিস এর সৃষ্টি করতে পারে। আপনারা নিশ্চই জানেন পেনক্রিয়াটাইটিস একটি মারাত্বক অসুখ। যার চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল এবং স্পেশিয়ালাইজড বড় বড় হাসপাতাল ছাড়া সম্ভব নয়। এমন কি ঐ সমস্ত হাসপাতালে ও অত্যন্ত ব্যায়বহুল চিকিৎসার পর বহুলাংশে রোগীর নানাবিধ জটিল সমস্যার এমনকি জীবন বিপন্ন হতে পারে।

৪. আপনারা নিশ্চয়ই জানেন অন্যান্য অংগের মত গলব্লাডারেও ক্যান্সার হতে পারে। প্রায় ৮০% ক্ষেত্রে এই ক্যান্সারের সাথে গলব্লাডারের পাথর। তবে পাথর সঠিক কি ধরনের ভূমিকা পালন করে তা সঠিক জানা নেই। আমি যে সমস্ত গলব্লাডারের ক্যান্সার অপারেশন করেছি তার প্রায় ৮০-৯০ ভাগ ক্ষেত্রে গলব্লাডারের ভিতর এক বা একাধিক পাথর পেয়েছি।

৫. আর একটা দিক দেখা যায় যে- যেহেতু নারীদের গলব্লাডারের পাথর জনিত সমস্যা বেশী তাই তাদের গলব্লাডারের ক্যান্সার ও পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী। তাই গলব্লাডারের পাথর দীর্ঘদিন রেখে দেয়া ঠিক নয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে উপসর্গহীন গলব্লাডারের পাথরের চিকিৎসা জরুরী:

১. গলব্লাডার পাথরের সাথে গলব্লাডার ওয়ালে ডিমের খোশার মত কেলসিফিকেশন হলে যেটাকে পেরসেলিন গলব্লাডার (Porcelin gala bladder) বলা হয়ে থাকে। পরসেলিন গলব্লাডার হচ্ছে গলব্লাডার ক্যান্সারের একটি প্রিকেনসারাস বা ক্যান্সারের পূর্বাবস্থা, এটা থেকে যে কোন সময় ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশী।

২. গলব্লাডার পাথরের সাথে বড় আকারের পলিপ (Pohyp) থাকলে, তার সঠিক চিকিৎসা করাতে হবে। মনে রাখতে হবে এইধরনের পলিপ থেকে ক্যান্সারের রূপ নিতে পারে।

৩. ডায়াবেটিক রুগীদের শরীরে অন্যান্য অংগেরমত গলব্লাডারেও ইনফেকশন এমনকি পাথরের সঙ্গে পুজ বা এম্পায়মা হতে পারে। এটাও একটা গলব্লাডারের জটিল অবস্থা। যেটা থেকে বাইলডাক্ট ও লিভারে ছড়িয়ে কলেঞ্জাইটিস বা লিভার এবসেস, রক্তে মিশে গিয়ে সেন্টিসেমিয়া ও ফেটে গিয়ে পেটে পেরিটনাইটিস হতে পারে। প্রত্যেকটিই একটি মারাত্মক অবস্থা।

৪. গলব্লাডার পাথরের সাথে গলব্লাডার বা পিত্তথলির দেয়াল অতিরিক্ত মোটা হলে এবং তাতে ক্যালসিয়াম জমে থাকলে তা ঠিকমত পরীক্ষা করে দেখতে হবে ও অপারেশন করতে হবে। এবং খুঁজে দেখতে হবে এতে ক্যান্সারের সূচনা হয়েছে কী না।

১৩ বছরের আগে শিশুদের হাতে স্মার্টফোন বাড়বে ঝুঁকি



চিকিৎসা সাময়িকী ডেস্ক

স্মার্টফোন এখন বড়দের পাশাপাশি অল্পবয়সী শিশুদের হাতেও এটি পৌঁছে গেছে। পড়াশোনা, যোগাযোগ অথবা বিনোদনের জন্য অনেক পরিবারে শিশুরা খুব ছোট বয়সেই নিজের স্মার্টফোন পেয়ে যায়।

কিন্তু সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে ১৩ বছর বয়সের আগে শিশুকে ফোন দেওয়া বিপজ্জনক। এর ফলে তাদের মধ্যে ঘুমের ব্যাঘাত, স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন ও বিষণ্নতাও দেখা দিতে পারে।

গবেষণায় শৈশব ও কৈশোরের মধ্যবর্তী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শিশুদের ওপর ফোন বা গ্যাজেটের স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা করেছেন গবেষকরা।

ব্রিটিশ পত্রিকা ইন্ডিপেনডেন্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ মাসের শুরুতে গবেণাপত্রটি প্রকাশ পেয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক জার্নাল 'আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স'-এ।

গত মাসের শুরুতে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য টিকটক ও ইনস্টাগ্রামসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে অস্ট্রেলিয়া।

গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন র‍্যান বারজিলে। 'ফিলাডেলফিয়া চিলড্রেন'স হাসপাতালের একজন শিশু-কিশোর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মনোরোগবিদ্যার অধ্যাপক তিনি। এ গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রের ২১টি অঞ্চলের সাড়ে দশ হাজারেও বেশি শিশুর তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন এই গবেষক।

গবেষণায় উঠে এসেছে, ১৩ বছর বয়সের তুলনায় যেসব শিশু ১২ বছর বয়সে হাতে ফোন পেয়েছে তাদের ঘুমের সমস্যার ঝুঁকি ৬০ শতাংশের বেশি এবং স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজনের ঝুঁকি ৪০ শতাংশের বেশি।

গবেষণাপত্রটিতে গবেষকরা লিখেছেন, 'যে তিন হাজার চারশ ৮৬ জন টিনএজার ১২ বছর বয়সে স্মার্টফোন পায়নি, ১৩ বছর বয়সে পৌঁছানোর পর তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। দেখা গেছে, যারা এই এক বছরের মধ্যে স্মার্টফোন হাতে পেয়েছে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন বিষণ্নতা বা উদ্বেগ ও অপর্যাপ্ত ঘুমের ঝুঁকি যারা এই সময়েও ফোন ব্যবহার শুরু করেনি তাদের তুলনায় অনেক বেশি।'

গবেষকরা বলছেন, বয়ঃসন্ধির শুরুতে স্মার্টফোন থাকার সঙ্গে বিষণ্নতা, স্থূলতা ও অপর্যাপ্ত ঘুমের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। ফলে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বা আইন তৈরির সুপারিশ করেছেন তারা।

বারজিলে বলেছেন, 'বিষয়টি একদমই এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়।'

সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ওপর জাতীয়ভাবে নিষেধাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধতা আরোপের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। দেশটি প্রযুক্তি জায়ান্টদের নির্দেশ দিয়েছে, ১০ ডিসেম্বর থেকে সামাজিক মাধ্যমে শিশুদের প্রবেশাধিকার যেন বন্ধ করে দেয়। মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশও আগামী বছর থেকে একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে।

এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য শিশুদের জন্য সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার সীমিত করতে আইন পাস করেছে। যার মধ্যে আরকানস, ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, লুইসিয়ানা, মিসিসিপি, ওহাইও এবং টেনেসি অন্যতম।

এসব রাজ্যতে কম বয়সী টিনএজারদের সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য মা-বাবার অনুমতির প্রয়োজন হয়।

শিশুদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকে 'জনস্বাস্থ্য সংকট' হিসেবে বর্ণনা করেছেন শিকাগোর সাবেক ডেমোক্রেটিক মেয়র রাহম ইমানুয়েল। শহরটির আইন প্রণেতাদের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যেন তারা অনুসরণ করেন।

তবে এ মাসের শুরুতে নিজেদের মার্কিন অংশীদারিত্ব বিক্রির জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে শর্ট ভিডিও প্লাটফর্ম টিকটক।

যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানিটির অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ থাকবে মার্কিন বিনিয়োগকারী কোম্পানি ওরাকল, সিলভার লেইক ও আবুধাবিভিত্তিক কোম্পানি 'এমজিএক্স'-এর হাতে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে টিকটক ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হল।

এখন মার্কিন টিকটক কোম্পানিটির ৪৫ শতাংশ মালিকানা পাবে এ তিনটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রত্যেকে ১৫ শতাংশ করে অংশীদার হবে।

অন্যদিকে, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মালিকানা থাকবে টিকটকের মূল কোম্পানি বাইটড্যান্সের বর্তমান বিনিয়োগকারীদের হাতে এবং বাকি প্রায় ২০ শতাংশ মালিকানা বাইটড্যান্স নিজেই রাখবে।



ভূমিকম্পের পর মাথা ঘোরালে করণীয়

চিকিৎসা সাময়িকী ডেস্ক

ভূমিকম্পের পর মাথা ঘোরা বেশ স্বাভাবিক শারীরিক প্রতিক্রিয়া। তবে শরীরের সংকেতগুলোকে হালকাভাবে না নেওয়াই ভালো। ভূমিকম্পের মতো আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু পৃথিবীকেই নাড়িয়ে দেয় না, আমাদের শরীর ও মনকেও ধাক্কা দিয়ে যায়।

ফলে ভূমিকম্প থেমে যাওয়ার পরও অনেকের মাথা ঘুরে, শরীর দুলে ওঠে কিংবা চারপাশটা অস্বাভাবিক মনে হয়। যদি এমন হয়, তবে প্রয়োজনে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে-কেন এমন হয়? চলুন জেনে নেওয়া যাক-

ভূমিকম্পের সময় আমাদের চোখ, কান ও শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গগুলো একসঙ্গে অ্যালার্ট মোডে বা অতিরিক্ত সতর্কাবস্থায় চলে যায়। তাই কম্পন থেমে গেলেও মস্তিষ্ক কিছুক্ষণ সেই কম্পনকে স্মৃতি হিসেবে ধরে রাখে। এতে দেহের ভারসাম্য-ব্যবস্থার বিভ্রান্তি হয়।

এ বিষয়ে ইউনিভার্সিটি অব টোকিওর ২০২২ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, শক্তিশালী ভূমিকম্পের সময় আমাদের ভেস্টিবুলার সিস্টেম, যা শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখে। হঠাৎ অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে যায়। তাই ভূমিকম্প থেমে যাওয়ার পরও এই সিস্টেম কিছুটা সময় দুলুনির সংকেত পাঠাতে থাকে, ফলে মাথা ঘুরে।

স্ট্যানফোর্ড সাইকোলজি ল্যাব বলছে, বিপদ বা আতঙ্কের মুহূর্তে করটিসল দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর হরমোন বেশি হলে মাথা ঝিম ঝিম, মাথা ঘোরা, বমিভাব দেখা দিতে পারে। আর ভূমিকম্পের পর বাস্তবে কম্পন না থাকলেও, উদ্বেগের কারণে মাথা হালকা লাগা, হাঁটাহাঁটিতে অসুবিধা, মাথায় চাপ-এসব হতে পারে।

এদিকে নেচার হিউম্যান বিহেভিয়ার-এ প্রকাশিত ২০২৩ সালের এক গবেষণা বলছে, মানুষ যখন দীর্ঘ সময় কম্পনের ভেতর থাকে, মস্তিষ্ক কয়েক মিনিট ধরে সেই নড়াচড়াকে বাস্তব বলে ধরে নেয়। তাই কম্পন থেমে যাওয়ার পরও শরীর যেন হালকা দুলতে থাকে। ভূমিকম্পের পর মাথা ঘোরা আমাদের শরীরের এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এটি সবসময় চিন্তার বিষয় নয়; যদি ১০-৩০ মিনিটের মধ্যে মাথা ঘোরা কমে যায়, পানি খেলেই শরীর স্বাভাবিক মনে হয় অথবা ঘুম বা বিশ্রামের পর ঠিক হয়ে যায়, তাহলে চিন্তার কিছু নেই। এটি সাধারণ ভেস্টিবুলার প্রতিক্রিয়া।

আর যদি মাথা ঘোরা ২৪ ঘণ্টার বেশি থাকে, বারবার বমি হয়। শরীর অসাড় লাগে। হাঁটতে কষ্ট হয়। তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ভূমিকম্পের পর যা করা উচিত-

দাঁড়িয়ে থাকলে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পড়ে যেতে পারেন। তাই বসে চোখ বন্ধ করলে ভেস্টিবুলার সিস্টেম দ্রুত শান্ত হয়। এরপর ধীরে পানি পান করুন। আর দুশ্চিন্তা ও ডিহাইড্রেশন মাথা ঘোরানো বাড়ায়। তাই দুই-তিন চুমুক পানি খান। এরপর গভীর শ্বাস নিন। স্ট্রেস হরমোন কমাতে ৪ সেকেন্ডে শ্বাস নিন, ৬ সেকেন্ডে ছাড়ুন। এটি আপনার মস্তিষ্ককে শান্ত করতে খুবই কার্যকর। এবার দ্রুত কিছু খাবার খান। রক্তে গ্লুকোজ কমে গেলের মাথা ঘুরে। বিস্কুট বা ফল খেলে উপকার পাবেন।

জেন-জিদের মধ্যে বাড়ছে ব্রেকআপের পর ছুটি চাওয়ার প্রবণতা

চিকিৎসা সাময়িকী ডেস্ক

'সম্প্রতি আমার ব্রেকআপ হয়েছে। কাজে মনোযোগ দিতে পারছি না। সামান্য বিরতি দরকার। আজ বাসা থেকে কাজ করব।' গুরগাঁওভিত্তিক জীবনসঙ্গী খোঁজার অ্যাপ 'নট ডেটিং'-এর এক কর্মীর পাঠানো এই সংক্ষিপ্ত ই-মেইল এখন পুরো ভারতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। কারণ, করপোরেট ভাষার বদলে এতে ছিল একেবারেই অকপট মানবিক আবেদন।

আরও অবাক করার বিষয়-প্রতিষ্ঠানটির সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মুহূর্তের মধ্যেই ওই কর্মীর ছুটি মঞ্জুর করেন এবং সেই ই-মেইল অনলাইনে শেয়ার করে লেখেন, "এটাই আমার দেখা সবচেয়ে সৎ ছুটির আবেদন।"



এরপরই পোস্টটি ভাইরাল হয় লিংকডইন, এক্স ও ইনস্টাগ্রামে। কেউ একে বলেছেন 'সহানুভূতিশীল নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত', আবার কেউ এটিকে 'পেশাগত সীমারেখা ভাঙার ঝুঁকি' বলে সমালোচনা করেছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনাটি আসলে কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রজন্ম-জেনারেশন জেড (Gen Z)-এর চিন্তাভাবনার প্রতিফলন।

বিশ্লেষকদের মতে, জেন-জি প্রজন্ম (১৯৯৭-২০১২ সালে জন্ম নেওয়া) বিশ্বাস করে-কর্মক্ষেত্রে মানবিক হওয়া দুর্বলতা নয়, বরং অপরিহার্য। কাজের দক্ষতার পাশাপাশি মানসিক স্থিতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তরাজ্যের লিগ্যাল অ্যান্ড জেনারেল গ্রুপ প্রোটেকশন-এর এক জরিপে দেখা গেছে, গত এক বছরে প্রতি তিনজন জেন-জি কর্মীর একজন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগেছেন-যা অন্য সব প্রজন্মের তুলনায় বেশি।

দীর্ঘদিন ধরে করপোরেট সংস্কৃতিতে 'পেশাদারিত্ব' মানে ছিল ব্যক্তিগত অনুভূতিকে আড়াল করা। কিন্তু কোভিড-পরবর্তী যুগে কাজ ও জীবনের সীমারেখা অনেকটাই মিশে গেছে। হাইব্রিড ওয়ার্ক, অনলাইন সংযোগ ও মানসিক চাপের কারণে অফিস এখন আর কেবল কাজের জায়গা নয়, অনেকের জন্য আবেগের জায়গাও হয়ে উঠেছে।

২০২৪ সালের ফিউচার ফোরাম জরিপ অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে ৪২ শতাংশ কর্মী বর্তমানে বার্নআউট (Burnout)-এর শিকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে ইতোমধ্যে 'পেশাগত মানসিক অবস্থা' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বার্নআউট বলতে বোঝায় দীর্ঘস্থায়ী ও অতিরিক্ত চাপ থেকে সৃষ্ট মানসিক, শারীরিক ও আবেগিক অবসন্নতা। এর লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্লান্তি, কাজ থেকে মানসিক দূরত্ব, উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং হতাশা।

ব্রেকআপের পর ছুটি কি যুক্তিযুক্ত?

মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, সম্পর্ক ভাঙা মানসিকভাবে অনেকটা শোকের মতো প্রভাব ফেলে। ঘুমের ব্যাঘাত, মনোযোগের ঘাটতি, উদ্যমহীনতাসব মিলিয়ে কর্মক্ষমতা কমে যায়। বিশেষ করে যেসব কর্মী আগেই মানসিক চাপে ছিলেন, তাদের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়।

তাই অল্প কিছুদিনের বিরতি অনেক সময় বার্নআউট প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে সব প্রতিষ্ঠানই এমন আবেগঘন ছুটি দিতে আগ্রহী নয়। অনেক এইচআর বিশেষজ্ঞের মতে, ব্যক্তিগত কারণকে ছুটির বৈধ অজুহাত হিসেবে স্বীকৃতি দিলে নীতিগত জটিলতা ও অপব্যবহার ঘটতে পারে।

অন্যদিকে, আধুনিক কর্মসংস্কৃতির সমর্থকেরা বলছেনসহানুভূতি ও পেশাদারিত্ব পরস্পরের বিপরীত নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক।

মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শ-প্রতিষ্ঠানগুলো চাইলে কিছু বাস্তবসম্মত কাঠামো গ্রহণ করতে পারে, যেমন:

মানসিক বা আবেগঘন কারণে ব্যক্তিগত ছুটির সুযোগ রাখা,

গোপনীয় মানসিক পরামর্শ সেবা (Employee Assistance Program),

ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ যাতে তারা কর্মীর মানসিক সংকেত বুঝতে পারেন,

ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের পর ধাপে ধাপে কাজে ফেরার সুযোগ তৈরি করা।

এতে একদিকে কর্মীর মর্যাদা রক্ষা পায়, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতাও অটুট থাকে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, সম্পর্ক ভাঙার পর মানসিক ভারসাম্য ধরে রাখার জন্য কর্মীদের উচিত-

আবেগের বিষয়টি স্বীকার করা,

অতিরিক্ত কাজের চাপ না নেওয়া,

প্রয়োজন হলে বাসা থেকে কাজ বা অল্প ছুটি নেওয়া,

ঘুম, ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা,

বিশ্বাসযোগ্য সহকর্মী বা কাউন্সেলরের সঙ্গে কথা বলা,

পেশাদার আচরণ বজায় রাখা, এমনকি উৎপাদনশীলতা কমলেও খোলামেলা জানানো।

মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, জেন-জি প্রজন্মের কাছে 'পেশাদারিত্ব' মানে আবেগ লুকিয়ে রাখা নয়, বরং আবেগের মধ্য দিয়েই দৃঢ় হয়ে ওঠা। তাই ব্রেকআপের পর ছুটি চাওয়া দুর্বলতা নয়-এটি স্বচ্ছতা ও মানসিক পরিপক্বতার প্রকাশ।



মেডিটেশন ক্যারিয়ারে সাফল্যের শক্তি

সৈয়দ তাওসিফ মোনাওয়ার

যেকোনো বিষয়ে সফল হতে চাইলে প্রয়োজন লক্ষ্য নির্ধারণ। এরপর প্রয়োজন হয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই নানাবিধ চিন্তা, দ্বিধা আর সংশয় আমাদের লক্ষ্য পুরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমন অনেক কিছুই আছে-যা আমরা কিছুটা চেষ্টা করলেই উতরে যেতে পারি, কিন্তু দ্বিধা ও সংশয়ের কারণে সহজ কাজটি কঠিন হয়ে ওঠে।

এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে মেডিটেশন বা মনের ব্যায়াম, যা আমাদের চিন্তাকে স্বচ্ছ করে, মনকে স্থির রাখে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

এখনকার কর্মব্যস্ত জীবনে নানামুখী চাপ ও প্রতিযোগিতার ভেতর আমরা অনেকসময় মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলি। এ অবস্থায় যেকোনো কাজ হয়ে ওঠে অনেক বেশি চ্যালঞ্জিং। ভালো ক্যারিয়ার গড়তে মেডিটেশনের চর্চা হতে পারে অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি, যা মনে প্রশান্তি ফিরিয়ে আনে।

আমাদের মস্তিষ্কে চিন্তার বিভিন্ন স্তর আছে। মেডিটেশনের মাধ্যমে নীরবে বসে সুনির্দিষ্ট অনুশীলন করে মনোযোগ বাড়ানো যায়, মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। যা পেশাজীবন, শিক্ষাজীবন বা কর্মজীবনে যেকোনো কাঙ্ক্ষিত অর্জনের দিকে এগোতে সাহায্য করে।

মেডিটেশন কেন দরকার

মেডিটেশন মানে মনোসংযোগের অনুশীলন। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানুষ নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও মনোযোগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে শেখে।ক্যারিয়ারের প্রতিযোগিতামূলক জগতে প্রতিদিনই নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। অনেকসময়ই মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ভুল হয়, সৃজনশীলতা কমে যায়। মেডিটেশনের মাধ্যমে মনকে প্রশিক্ষিত করা যায় শান্ত থাকতে, স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে। এতে কাজে নিয়ন্ত্রণ বাড়ে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয় এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়।

মেডিটেশনের প্রভাব

মেডিটেশন ক্যারিয়ার গ্রোথেও সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। নিচে কিছু দিক তুলে ধরা হলো-মনোযোগ বৃদ্ধি: নিয়মিত মেডিটেশন করলে কাজে মনোযোগ
বাড়ে। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট অফিস বা পড়াশোনার চাপ সহজে সামলানো যায়।

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স: আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়ে, ফলে টিমওয়ার্ক ও লিডারশিপ দক্ষতা বাড়ে।

সৃজনশীল চিন্তা: মন শন্ত থাকলে নতুন ধারণা ও সমাধান বের করা সহজ হয়।

স্বচ্ছ সিদ্ধান্তগ্রহণ: মেডিটেশন নিজের অগ্রাধিকার ও লক্ষ্য বুঝতে সাহায্য করে।

মেডিটেশনের পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ

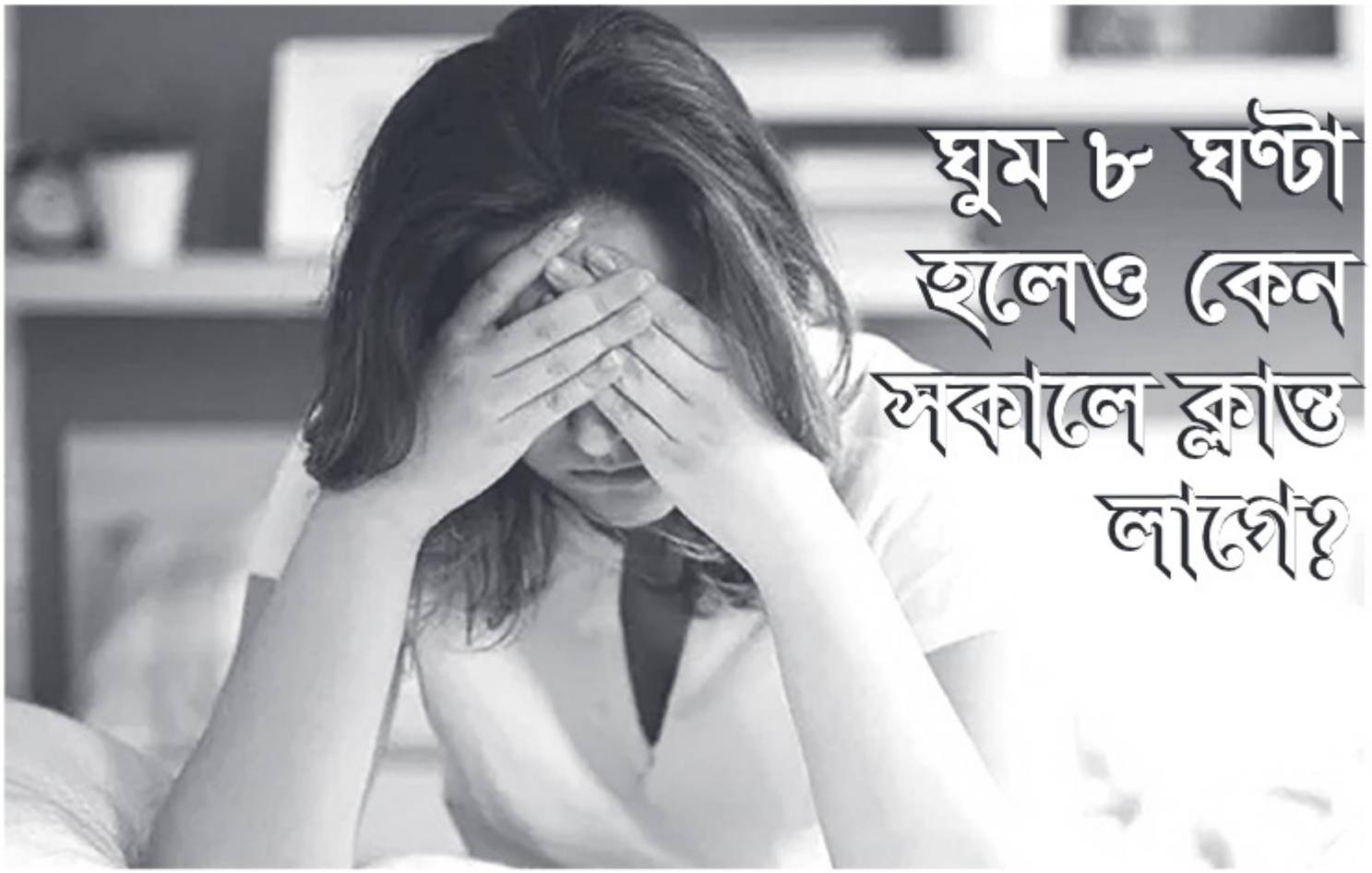
মেডিটেশন শেখার জন্য এখন অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সিলভা মেথড এবং কোয়ান্টাম মেথড বিশেষভাবে জনপ্রিয়।

সিলভা মেথড: যুক্তরাষ্ট্রের জোসে সিলভা উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিতে মনোযোগ, ইতিবাচক চিন্তা ও মানসিক শক্তি বাড়ানোর কৌশল শেখানো হয়। দেশে এর শাখা রয়েছে। কোয়ান্টাম মেথড বাংলাদেশে শহীদ আল বুখারি প্রবর্তিত এই পদ্ধতিতে মেডিটেশনের মাধ্যমে আত্মউন্নয়ন, মানসিক প্রশান্তি ও লক্ষ্য অর্জনের দীক্ষা দেওয়া হয়।

এগুলোর মূল উদ্দেশ্য একটাই-মানুষ যেন নিজের ভেতরের শক্তিকে চিনতে পারে, মনোসংযোগ বাড়ায় এবং দৈনন্দিন কাজের ভারসাম্য রক্ষা করার মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করে।

কীভাবে শুরু করবেন

সিলভা বা কোয়ান্টামের প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। এরপর মেডিটেশন করতে কোনো বিশেষ জায়গা বা সময় লাগবে না। প্রতিদিন সকালে বা ঘুমানোর আগে ১০-১৫ মিনিটের চর্চা করলেই নিজের ভেতর ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করবেন। এখন অনলাইনেও বিনামূল্যে মেডিটেশন সেশন পাওয়া যায়, তবে সরাসরি প্রশিক্ষণ কোর্স করলে ফলাফল ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।



ঘুম ৮ ঘণ্টা হলেও কেন সকালে ক্লান্ত লাগে?

চিকিৎসা সাময়িকী ডেস্ক

আপনি হয়তো প্রতিদিনই ৮ ঘণ্টা ঘুমাচ্ছেন। আলো নিভিয়ে, বিছানায় শুয়ে, সারা রাত ঘুমিয়েও সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখছেন- শরীর ভারী, মন খারাপ, আর দিনটা শুরু হওয়ার আগেই ক্লান্ত লাগছে। যদি এই অভিজ্ঞতা আপনার হয়ে থাকে তবে এতে আপনি একা নন। বর্তমান সময়ে অনেকেই এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। এর কারণ ঘুমের পরিমাণ নয় ঘুমের মানটাই আসল বিষয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে বলা হয়ে থাকে প্রতিদিন অন্তত ৭৮ ঘণ্টা ঘুম শরীরের পুনরুদ্ধারের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু ঘুমবিজ্ঞান ও শিশু স্নায়ুবিজ্ঞানে ২০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞ ড. ক্রিস্টোফার জে. অ্যালেন বলেছেন- তোমার আরও বেশি সময় ঘুমের দরকার নেই বরং ভালো ঘুমের দরকার।

তিনি বলেন, অনেকেই ৮ ঘণ্টা ঘুমালেও সকালে ক্লান্ত বোধ করেন। এর কারণ হলো ঘুমের মান খারাপ হওয়াড় অর্থাৎ ঘুমের চক্র (light sleep, deep sleep, REM) ঠিকভাবে সম্পন্ন না হওয়া।

নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্যও ঘুমের মান খারাপ হতে পারে:

১. নিদ্রাহীনতা/ঘুম-শ্বাস সমস্যা- গোপন শ্বাসবদ্ধতা (Sleep Apnea), শ্বাসের অনিয়ম, বা ঘুমে হঠাৎ শ্বাস থেমে যাওয়া ঘুমের মান নষ্ট করে।

২. স্ক্রীন টাইম বেশি - ঘুমের আগে মোবাইল/ট্যাব বা ল্যাপটপ ব্যবহার ঘুমের গুণমান খারাপ করতে পারে।

৩. অনিয়মিত ঘুমচক্র - রাত এবং দিন মিলিয়ে ঘুমের সময়ের অনিয়ম থাকলে ঘুম ঠিকমতো কাজ করে না।

ভালো ঘুম মানে এমন ঘুম যা গভীর, অবিচ্ছিন্ন এবং পুনরুদ্ধারমূলক (restorative)। এই সময় শরীর কোষ পুনর্গঠন করে, স্মৃতি স্থায়ী হয়, হরমোন ভারসাম্য ঠিক হয় এবং মস্তিষ্ক টক্সিন পরিষ্কার করে। তাই সময় যতই হোকড় যদি এই ধাপগুলো সম্পূর্ণ না হয় আপনি সকালে ক্লান্তই থাকবেন।

ঘুমের মান ভালো রাখার ৭টি বৈজ্ঞানিক উপায়:

১. একই সময়ে ঘুমানো ও জাগা: প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় মেনে ঘুমালে আবার একই সময়ে উঠলে শরীরের জৈবিক ঘড়ি (circadian rhythm) স্থিতিশীল থাকে।

২. স্ক্রীন টাইম কমানো: ফোন বা ল্যাপটপের নীল আলো melatonin হরমোনের নিঃসরণ কমায় যা ঘুম বিলম্বিত করে। তাই ঘুমানোর অন্তত ৩০ মিনিট আগে ফোন বা ল্যাপটপের ব্যাবহার বন্ধ করুন।

৩. ঘর ঠান্ডা, অন্ধকার ও নিরব রাখুন: আদর্শ ঘুমের তাপমাত্রা প্রায় ১৮-২০°C। হালকা পর্দা ও আরামদায়ক বিছানা সহায়ক ভালো ঘুমের সহায়ক।

৪. ক্যাফেইন সীমিত করুন: বিকেল বা রাতে চাকফি এড়িয়ে চলুন। ক্যাফেইন ঘুম ভাঙার প্রধান কারণ।

৫. নিয়মিত শরীরচর্চা করুন: ব্যায়াম ঘুমের মান উন্নত করে তবে ঘুমানোর অন্তত ৩ ঘণ্টা আগে শেষ করুন।

৬. মানসিক প্রশান্তি আনুন: ঘুমের আগে হালকা বই পড়া, ধ্যান বা গভীর শ্বাস নেওয়া মস্তিষ্ককে শান্ত করে। এতে ঘুম ভালো হয়।

ভালো ঘুম মানে কেবল দীর্ঘ সময় নয়ড়এটা এমন এক মানসম্মত বিশ্রাম, যা আপনাকে সকালে শক্তি, মনোযোগ ও ভালো মানসিক অবস্থা দেয়। তাই আজ থেকেই বেশি নয়, ভালো ঘুমের অভ্যাস গড়ে তুলুন। সূত্র: এনডিটিভি

সুস্থ হার্ট, কিন্তু রোগ লুকিয়ে রয়েছে ছোটখাটো ইঙ্গিতেই! ৯টি লক্ষণ দেখে সতর্ক হতে হবে



আপনার হার্ট যদি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়, তা হলে কয়েকটি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে গ্যাস, অম্বল, ক্লান্তি বা অন্য কোনও সাধারণ অসুখ মনে হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। দেখে নিন উপসর্গের তালিকা।



হার্টের কাজে বিরাম নেই। পেশিবহুল এই অঙ্গ একটানা পুরো শরীরে অক্সিজেন ও পুষ্টিসমৃদ্ধ রক্ত সঞ্চালন করে। সেই অঙ্গে কোনও সমস্যা দেখা দিলে কোনও না কোনও ইঙ্গিত মিলবেই। 'সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাক'-এর ক্ষেত্রেও অস্পষ্ট, হালকা উপসর্গ দেখা দিতে পারে কখনও কখনও। ফলে সতর্ক থাকা দরকার হার্ট নিয়ে। আপনার হার্ট যদি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়, তা হলে কয়েকটি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে গ্যাস, অম্বল, ক্লান্তি বা অন্য কোনও সাধারণ অসুখ মনে হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

এখানে সবচেয়ে জরুরি কিছু লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হল, যা উপেক্ষা করা উচিত নয়ড়

১. বুকে অস্বস্তি- নানা কারণে ব্যথা হতে পারে বুকে। গ্যাস ভেবে অনেকেই অবহেলা করে যান। কিন্তু বুকে অস্বস্তি হওয়ার কারণ হার্টের সঙ্গে জড়িত কি না, তা সবার আগে জেনে নেওয়া উচিত। তাই তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া জরুরি।

২. প্রবল ক্লান্তি- দৈনন্দিন কাজ করেই হাঁপ ধরে যায়? ব্যাগ বওয়া বা সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মতো সাধারণ কিছু কাজ করেও যদি প্রবল ক্লান্তি নেমে আসে শরীরে, তা হলে উপেক্ষা করবেন না। সম্ভবত, হার্টের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। হার্ট যখন শরীরের চাহিদা অনুযায়ী রক্ত পাম্প করতে পারে না, তখন সারা শরীরের পেশি ক্লান্ত হয়ে আসে।

৩. বাহুতে ব্যথা- হার্ট সংক্রান্ত সমস্যা থাকলে শরীরের বাঁ দিকে ব্যথা ছড়াতে পারে। বাঁদিকের বাহু ও হাত পর্যন্ত ব্যথা হতে পারে। হার্ট অ্যাটাকের সবচেয়ে সাধারণ উপসর্গগুলির মধ্যে একটি এটি।

৪. চোয়াল/ গলা ব্যথা- বুক ছাড়াও চোয়াল, ঘাড়, পিঠ, গলা বা বাঁ হাতে চাপ চাপ ব্যথা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

৫. শ্বাসকষ্ট- শুয়ে থাকলে বা ঢাল ও সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময়ে দম ফুরিয়ে আসে? সামান্য পরিশ্রমের পরেও শ্বাসকষ্ট হয়? হয়তো আপনার হার্ট চাপে রয়েছে, তাই সে কথারই জানান দিচ্ছে।

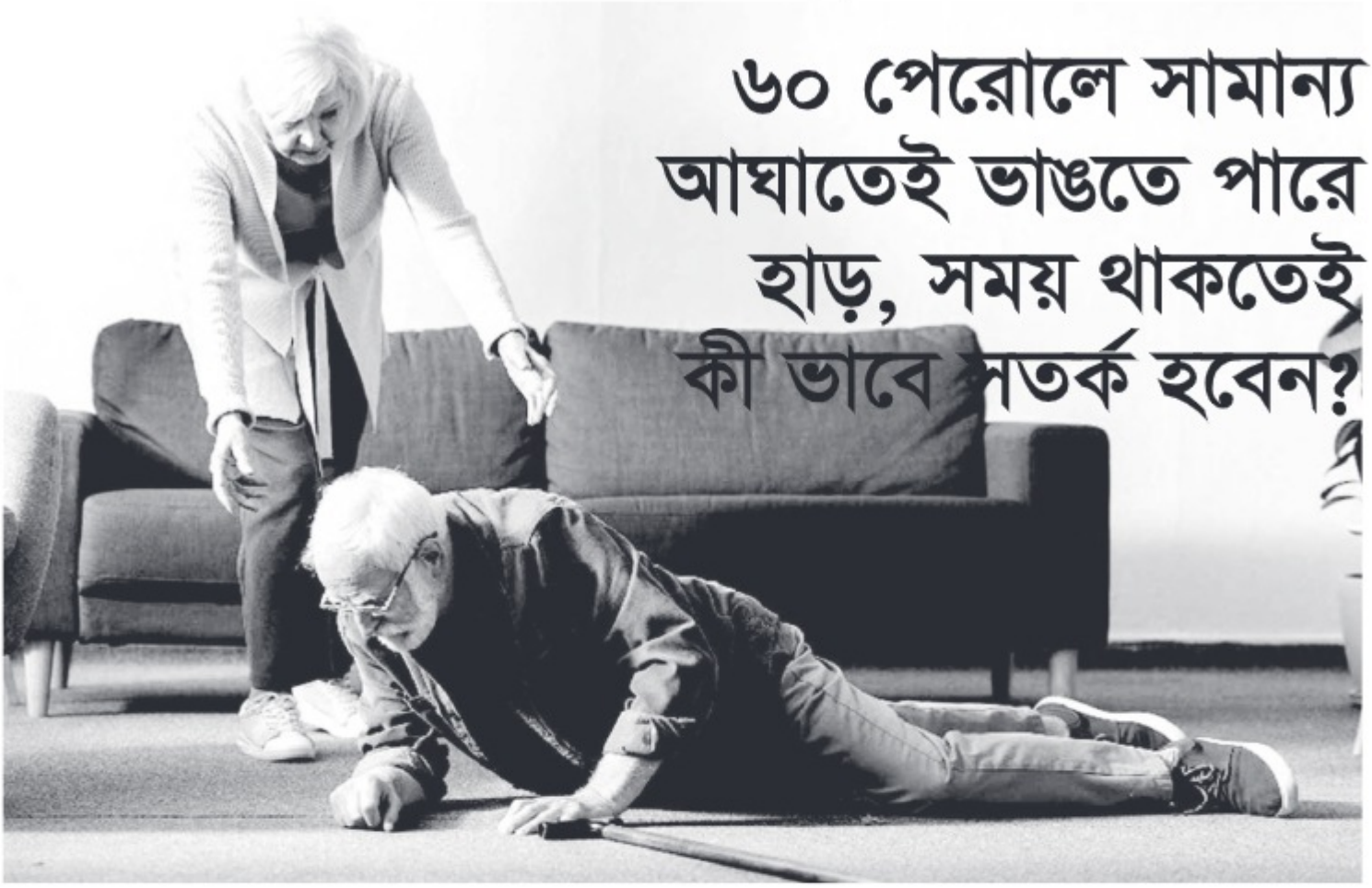
৬. পা ফুলে যাওয়া- শরীরের টিস্যুতে অতিরিক্ত তরল জমে ফুলে যেতে পারে। এই অবস্থাকে এডিমা বলে। যখন হার্ট শরীর থেকে ফিরে আসা রক্ত ঠিক মতো পাম্প করতে পারে না, তখনই এডিমা বা শরীরে পানি জমার সমস্যা দেখা দেয়। তাই এই রোগ দেখা দিলে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

৭. অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন- দৌড়োনো, শরীরচর্চা, দুশ্চিন্তা ছাড়াও যদি ঘন ঘন হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, বা যখন-তখন ওঠানামা করতে থাকে, তা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত হলে হার্ট শরীর বা মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত রক্ত পাম্প করতে পারে না। এতে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

৮. মাথা ঘোরা- বুকে অস্বস্তি, শ্বাসকষ্ট হওয়ার পাশাপাশি মাথা ঘোরার উপসর্গ দেখা দিলে সতর্ক হতে হবে। হয়তো হার্ট ঠিক মতো রক্ত পাম্প করতে পারছে না বলে রক্তচাপ কমে গিয়েছে। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে হবে সঙ্গে সঙ্গে।

৯. অস্বাভাবিক ঘাম- যদি দেখেন, মাঝেমধ্যে কোনও পরিশ্রম ছাড়াই শরীর থেকে অসম্ভব ঘাম বেরোচ্ছে, তা হলে তা হার্টের অসুখের ইঙ্গিত হতে পারে।

৬০ পেরোলে সামান্য আঘাতেই ভাঙতে পারে হাড়, সময় থাকতেই কী ভাবে সতর্ক হবেন?



বার্ধক্যজনিত অসুখের কষ্ট আছেই। তার উপর হাড় ভাঙলে যন্ত্রণার শেষ থাকে না। বয়সকালে এমন বিপদ এড়াতে সতর্ক হওয়া দরকার আগে থেকেই। কী ভাবে এমন ঝুঁকি কমানো যায়?

বয়সজনিত অসুখ রয়েছেই। তার উপর পড়ে গিয়ে হাত-পা কিংবা কোমর ভাঙলে রক্ষে নেই! অথচ সেই ঘটনাই ঘটে যায় মুহূর্তের অসাবধানতায়। পা পিছলে গোসলখানা বা মেঝেতে আছাড় খেলেই ব্যস!

'ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন'-এ প্রকাশিত 'বিএমজে কোয়ালিটি এবং সেফটি' নামক জার্নালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, বয়সকালে নিতম্বের হাড় ভাঙার পরে ২০-৩০ শতাংশ রোগীর মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়। হাড় ভাঙার কষ্টও নেহাত কম নয়। সামান্য আঘাতে বা এক বার পড়ে গিয়ে হাড় ভাঙার কারণ হতে পারে হাড়ের দুর্বলতা। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অস্টিয়োপোরোসিসের মতো অসুখের ঝুঁকি বাড়ে, ভিটামিন ডি-এর অভাবে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। এমন বিপদ এড়াতে কিন্তু বয়স থাকতেই সতর্ক হওয়া ভাল। যে বিষয়গুলিতে নজর দেবেনড়

ভিটামিন ডি: ভারতে একটি বড় অংশের জনসংখ্যার মধ্যেই কিন্তু ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি দেখা যায়। শুধু বয়স্কেরা নন, এই ভিটামিনের ঘাটতিতে ভোগেন অপেক্ষাকৃত কমবয়েসিরাও। কর্মসংস্কৃতির বদল, ব্যস্ততার জন্য অনেকেই নিয়ম করে গায়ে রোদ লাগাতে পারেন না বা খোলা জায়গায় দিনে হাঁটাহাটি করেন না। তার ফলে কম বয়স থেকেই হাড় দুর্বল হতে শুরু করে। নিয়ম করে হাঁটাহাটি, ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হলে ডাক্তার দেখিয়ে সাপ্লিমেন্ট নেওয়া জরুরি।

ওয়ার্ম আপ: শরীরচর্চা করার সময় ওয়ার্মআপ জরুরি। এতে শরীর, মাংসেপশির তাপমাত্রা বাড়ে। কারণ ওয়ার্ম আপ না করে ব্যায়াম করতে গেলে কেউ পেশিতে চোট পেতে পারেন। শরীরচর্চার শুরুটা করা দরকার ডায়নামিক স্ট্রেচিং দিয়ে। এতে শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। পেশির সঙ্কোচন এবং প্রসারণের ফলে রক্তচলাচল ভাল হয়।

সঠিক শরীরচর্চা: বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর বুঝে শরীরচর্চাতেও বদল দরকার। অস্টিয়োপোরোসিসের মতো সমস্যা থাকলে ওজন নিয়ে শরীরচর্চা করা ভাল। তবে কী ভাবে তা করতে হবে, সেটি কোনও পেশাদারের কাছ থেকে শিখে নেওয়া জরুরি। জগিং, হাঁটাহাটির পাশাপাশি সঠিক কৌশলে যোগাসন করলে বয়সকালে অস্থিসন্ধির সমস্যা কমবে।

ডায়েট: হাড় মজবুত রাখতে ডায়েট গুরুত্বপূর্ণ। প্রদাহনাশক খাবার রাখতে হবে তালিকায়। ভিটামিন ডি এবং প্রয়োজনীয় খনিজও জরুরি। তৈলাক্ত মাছ, আখরোট, তিসিবীজের মতো খাবার অস্থিসন্ধির ফোলা ভাব কমাতে সাহায্য করে। রাগি, সাদা তিলের মতো খাবার ক্যালশিয়ামের জোগান বাড়ায়, যা হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য জরুরি।

হাড় ভাঙা রুখতে আর কী করবেন?

* বয়সকালে হাড় ভাঙার অন্যতম কারণ শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়া। যে ধরনের ব্যায়াম শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখে, সেগুলি অভ্যাস করা দরকার।
* পা হড়কে পড়ে গিয়েও বিপদ ঘটে। এমন জুতো বা চটি বয়স্কদের দিন, যেগুলি চট করে হড়কে যাবে না।
* ঘরের মেঝেতে পানি পড়লে দ্রুত মুছে নিন, পা হড়কে যেতে পারে এমন জিনিস পড়ে থাকলে দ্রুত পরিষ্কার করে নিন।
* অন্ধকার বা কম আলোযুক্ত জায়গা দিয়ে হাঁটাচলা করতে গেলেও পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। এ ব্যাপারে সতর্কতা জরুরি।



জিন নয়, দীর্ঘায়ু নির্ধারণে বেশি প্রভাব ফেলে খাদ্যাভ্যাস: গবেষণা

ডা. শাহজাদা সেলিম

দীর্ঘজীবন অনেকেই ভাগ্য বা বংশগত জিনের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। অনেকে বলেন, 'আমাদের পরিবারে সবাই আগে মারা গেছে, তাই আমারও তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা।'

তবে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, মানুষের আয়ু নির্ধারণে জিনের চেয়ে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের ভূমিকা অনেক বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘায়ু অর্জন সম্ভব-এমনকি পরিবারে দীর্ঘজীবনের ইতিহাস না থাকলেও।

জিন বনাম খাদ্যাভ্যাস: গবেষণা কী বলছে?

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ একাধিক আন্তর্জাতিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান লক্ষাধিক মানুষের দীর্ঘমেয়াদি তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছে, মানুষের মোট আয়ুর মাত্র ২০ থেকে ৩০ শতাংশ জিনগতভাবে নির্ধারিত হয়। বাকি ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ নির্ভর করে জীবনযাপনের ধরনে। আর সেই জীবনযাপনের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সহজে পরিবর্তনযোগ্য উপাদান হলো প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাস।

গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্যতালিকা বা ড্যাশ ডায়েটের মতো স্বাস্থ্যকর খাদ্যপদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাদের মধ্যে হৃদরোগ, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার ও স্ট্রোকের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

আশ্চর্যের বিষয়, এই সুবিধা তারাও পেয়েছেন যাদের পরিবারে দীর্ঘজীবনের ইতিহাস নেই এবং যাদের জিনগত ঝুঁকিও তুলনামূলক বেশি। এতে প্রমাণিত হয়, সঠিক খাদ্যাভ্যাস জিনের সীমাবদ্ধতাকেও কার্যকরভাবে অতিক্রম করতে পারে।

কোন খাবার আয়ু বাড়ায়?

গবেষকেরা দীর্ঘায়ুর সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি খাদ্যগোষ্ঠী চিহ্নিত করেছেন-

শাকসবজি ও ফলমূল: প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে রঙিন শাকসবজি ও তাজা ফল খেলে শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের জোগান বাড়ে, যা কোষের ক্ষয় রোধ করে এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ কমায়। পালংশাক, গাজর, টমেটো, আম ও পেঁপে বিশেষ উপকারী।

গোটা শস্য ও ডালজাতীয় খাবার: লাল চাল, ওটস, মসুর ডাল, ছোলা ও শিমজাতীয় খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া বাড়ায় এবং দীর্ঘস্থায়ী শক্তি জোগায়।

স্বাস্থ্যকর চর্বি: জলপাই তেল, আখরোট, কাজুবাদাম এবং মাছে থাকা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখে ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা দীর্ঘদিন বজায় রাখতে সাহায্য করে।

প্রক্রিয়াজাত খাবার পরিহার: অতিরিক্ত চিনি, লবণ, ট্রান্স ফ্যাট ও প্রক্রিয়াজাত মাংস শরীরে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ সৃষ্টি করে, ইনসুলিন প্রতিরোধ বাড়ায় এবং কোষের বার্ধক্য ত্বরান্বিত করে।

খাদ্যাভ্যাস কীভাবে জিনকে প্রভাবিত করে?

বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো- সুষম খাদ্যাভ্যাস শুধু পুষ্টি সরবরাহই করে না, বরং জিনের কার্যপ্রণালিকেও প্রভাবিত করে। এপিজেনেটিক্স শাখার গবেষণা বলছে, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ক্ষতিকর জিনকে নিষ্ক্রিয় এবং সুরক্ষাকারী জিনকে সক্রিয় করতে পারে।

অর্থাৎ জন্মসূত্রে পাওয়া জিনের কিছু নেতিবাচক প্রভাবও প্রতিদিনের খাবারের মাধ্যমে আংশিকভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব- যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী উপলব্ধি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগের বোঝা দ্রুত বাড়ছে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার অন্যতম প্রধান কারণ খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন। অথচ আমাদের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যতালিকায় ডাল, শাকসবজি, মাছ, ভাত ও মৌসুমি ফল- দীর্ঘায়ুর প্রায় সব উপাদানই রয়েছে। প্রয়োজন শুধু ফাস্টফুড ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সচেতনভাবে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে ফিরে আসা।

উপসংহার

বিজ্ঞান এখন স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে- ভাগ্য বা জিনের ওপর নির্ভর করে বসে থাকার সময় শেষ। আপনার প্রতিদিনের খাবারই হতে পারে সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্যবিমা। সঠিক খাদ্যাভ্যাস মানে শুধু রোগমুক্ত থাকা নয়; বরং সুস্থ, সক্রিয়, আনন্দময় ও দীর্ঘ জীবন নিজের হাতে গড়ে নেওয়া। পরিবর্তনটা কঠিন নয়- দরকার কেবল সচেতনতা ও ইচ্ছাশক্তি। আজই শুরু হোক সেই পরিবর্তন, আপনার নিজের থালা থেকে।

পায়ে টান ধরা বা ব্যথা মানেই ক্লান্তি বা জলাভাব নয়!

এটি নানা জটিল রোগের ইঙ্গিতও হতে পারে

পায়ে ক্র্যাম্প বা টান ধরাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখেন না অনেকেই। কেউ ভাবেন, অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণে এমন হচ্ছে। কেউ মনে করেন সারা দিন ভাল ভাবে পানি খাওয়া হয়নি।

ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে মারাত্মক টান ধরল পায়ে। এতটাই যে বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না কিছু ক্ষণ। কিংবা অফিসের চেয়ারে বসে বসেই শুরু হল পায়ে ব্যথা। হাঁটতে গিয়ে এমন টান ধরল যে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু ব্যথা কমে যেতেই ভুলে গেলেন।'



পায়ে ক্র্যাম্প বা টান ধরাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখেন না অনেকেই। কেউ ভাবেন, অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণে এমন হচ্ছে। কেউ মনে করেন সারা দিন ভাল ভাবে পানি খাওয়া হয়নি। কিংবা প্রচুর ছোটাছুটি, হাঁটাহাঁটি হয়েছে বলে এমন হচ্ছে। ভাবনাগুলি ভুল নয়। তবে পায়ে ব্যথা নিয়মিত ভাবে হতে শুরু করলে, কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখা জরুরি।

পায়ের ব্যথা কী কী কারণে হতে পারে?

খনিজের ভারসাম্য নষ্ট হলে

শরীরে কেবল পানি নয়, নির্দিষ্ট কিছু খনিজের অভাব হলেও পেশিতে টান ধরে। যেমন-

১. ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম: এই দুটি খনিজ পেশির সংকোচন ও প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে। শরীরে এর অভাব হলে পেশিতে টান ধরা স্বাভাবিক।

২. ক্যালশিয়াম: রক্তে ক্যালশিয়ামের মাত্রা কমে গেলেও স্নায়ু অতিসংবেদনশীল হয়ে পড়ে, ফলে পেশিতে টান ধরা বা খিঁচুনি লাগতে পারে।

হৃদরোগের সতর্কবার্তা?

যদি পায়ের ধমনীতে রক্ত চলাচল বাধা পায়, তবে হাঁটাচলা বা কাজ করার সময় পায়ে তীব্র ব্যথা বা ক্র্যাম্প হতে পারে। একে বলা হয় পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ। সাধারণত বিশ্রাম নিলে এই ব্যথা কমে যায়, কিন্তু এটি হৃদরোগের একটি আগাম সতর্কবার্তা হতে পারে।

স্নায়ুরোগ!

মেরুদণ্ডের স্নায়ুতে চাপ পড়লেও পায়ে ব্যথা বা ক্র্যাম্প হতে পারে। সাধারণত বেশি ক্ষণ হাঁটলে বা দাঁড়ালে ওই ব্যথা বাড়ে। তাই ব্যথা নিয়মিত হতে থাকলে উপসর্গ মিলিয়ে দেখুন। যদি মিলে যায়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত হবে।

দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা

দীর্ঘদিন ধরে ভোগায় এমন ক্রনিক অসুখ থেকেও পায়ে ব্যথা বা টান ধরার সমস্যা তৈরি করতে পারে। যেমন-

১. ডায়াবিটিস: রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকলে স্নায়ুর ক্ষতি হয়। একে বলা হয় ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি, যা থেকে পায়ে অস্বস্তি বা টান ধরার মতো অনুভূতি হতে পারে।

২. থাইরয়েড: হাইপোথাইরয়েডিজম বা থাইরয়েড হরমোনের অভাব ঘটলেও পেশিতে ব্যথা হতে পারে বা টান ধরতে পারে।

৩. কিডনিররোগ: কিডনি ঠিকমতো কাজ না করলে শরীরে টক্সিন বা বিষাক্ত বর্জ্য জমে যায়।এতে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য নষ্ট হয়, যা থেকেপায়ে টান ধরে।

ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

উচ্চ রক্তচাপের জন্য ব্যবহৃত 'ডাই-ইউরেটিক্স' ওষুধ, কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ বা ক্যানসার থেরাপির কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবেও পায়ে ব্যথা করা বা টান ধরার মতো সমস্যা হতে পারে।

থ্রম্বোসিস সতর্কতা

যদি দেখেন পায়ে টান ধরার পাশাপাশি পা ফুলে যাচ্ছে, লাল হয়ে যাচ্ছে বা ত্বক বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তবে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এটি 'ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস' বা রক্ত জমাট বাঁধার লক্ষণও হতে পারে।



পিসিওএস ও সচেতনতা

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সারা বিশ্বে আটজনের মধ্যে অন্তত একজন মহিলা নাকি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম ভোগেন। ভারতে এই হার ছ'জনের অনুপাতে একজন। মূলত, এটি একটি হরমোনাল কন্ডিশন যা সন্তান ধারণের বয়সে পৌঁছোনো মহিলাদেরই হয়ে থাকে। এর প্রধান লক্ষণই হল অনিয়মিত পিরিয়ডস। পিরিয়ডস প্রতি মাসে না হওয়ায় ওভুলেশনও যথাযথ হয় না। ফলে ডিম্বাণু ঠিকমতো গ্রো করতে পারে না, আকারে ছোট থাকে। এগুলিই পরীক্ষা করলে ওভারিতে থাকা ছোট ছোট সিস্টের মতো দেখতে লাগে। এ কারণেই একে বলে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম। বর্তমানের সেডেন্টারি জীবনযাপনের কারণে একদিকে যেমন বাড়ছে পিসিওএস-এর উপসর্গ, তেমনই আবার এর সমাধানও লুকিয়ে সঠিক জীবনযাপনের মধ্যেই...

পিসিওএস মানেই বন্ধ্যাত্ব নয়

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, পিসিওএসের সঙ্গে শুধু বন্ধ্যাত্ব নয় বরং আরও একাধিক অসুখের যোগ আছে। যেমন, হরমোনাল ইমব্যালান্স ও মেটাবলিক সিনড্রোম। পিসিওএসে যাঁরা ভুগছেন তাঁদের কেউ কেউ বন্ধ্যাত্বে ভোগেন, তেমনই কেউ কেউ অনিয়মিত মেনস্ট্রুয়াল সাইক্ল, একাধিক লং টার্ম সমস্যা (যেমন, ডায়াবিটিস, এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লেসিয়া, ওবিসিটি ইত্যাদি) ও ডিপ্রেশনেও ভোগেন।

এবার আসা যাক, বন্ধ্যাত্ব প্রসঙ্গে। পিসিওএস হলেই সন্তান ধারণ সম্ভব নয়, এটি ভুল ধারণা। অনেকেরই পিসিওএস থাকলেও প্রতি মাসে সঠিক সময়ে ওভুলেশন হয়, পিরিয়ডসও নিয়মিত হয়। আবার কিছু মহিলা আছেন যাঁদের পিরিয়ডস অনিয়মিত হলেও মাঝে মাঝে ওভুলেশন হয়। এঁরা আনপ্রোটেক্টেড ইন্টারকোর্স করতে থাকলে প্রেগন্যান্সি এসে যায়। এর বাইরে একদল আছেন যাঁদের পিরিয়ডস অনিয়মিত, ওভুলেশনও হয় না। এঁরাই মূলত বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় ভোগেন। পিসিওএস থাকলে, ওভুলেশন হলেও ডিম্বাণুর কোয়ালিটি সাধারণত ভাল হয় না। আবার ওভুলেশনের পর ফার্টিলাইজেশন হলেও জরায়ুর মধ্যে এমব্রায়োর বসতে অসুবিধে হয়। আবার পিসিওএস থাকলে তাঁদের শরীরে অনেক সময়েই ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বেশি হয়। এন্ডোমেট্রিয়ামের সাধারণ বায়োকেমিক্যাল প্যারামিটার বদলে যায় এর ফলে। দেখা গিয়েছে, পিসিওএস থাকলে অনেকের প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টরেও পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।সবমিলিয়ে, এমব্রায়ো জরায়ুতে অ্যাটাচড হওয়ার পরও কিন্তু কিছু সমস্যা হতে পারে পিসিওএস থাকলে। একাধিক হরমোন অল্টারেশনের ফলে মিসক্যারেজের পাশাপাশি প্রেগন্যান্সিতে ডায়াবিটিসের আশঙ্কা বাড়তে পারে, এমনকি হার্টের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এই দুয়ের অন্যতম কারণ ওবিসিটি ও ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বেশি হওয়া। পিসিওএস শুধু কনসিভ করতে সমস্যা তৈরি করে না, সুস্থ সন্তান ধারণ অবধি জটিলতা তৈরি করতে পারে।

কখন সতর্ক হবেন?পিসিওএস থাকলে যদি আগেভাগে চিকিৎসা (বা ম্যানেজমেন্ট) শুরু করা যায়, তা হলে কনসিভ করা মোটেও অসম্ভব নয়। অনেকের ক্ষেত্রেই পিসিওএস ডায়াগনোসড হয় সন্তান ধারণে সমস্যা হলে। তার আগে অবধি অনিয়মিত পিরিয়ডস বা ওজন বাড়ার সমস্যাকে অবহেলা করেন বেশিরভাগ মহিলাই। ডায়াগনসিসের বিলম্ব ফার্টিলিটির ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা। কারণ, বয়স বাড়তে থাকলে মহিলাদের প্রেগন্যান্সির সম্ভাবনাও কমতে থাকে। অনিয়মিত মেনস্ট্রুয়াল সাইক্ল (১২ মাসের মধ্যে যদি সাত-আট মাস পিরিয়ডস হয় বা টানা তিন-চার

মাস না হয়, অল্প পিরিয়ডসের পাশাপাশি মাঝেমধ্যে অতিরিক্ত ব্লিডিং হয়), থাইরয়েড বা অন্য কোনও সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও ওজন বাড়া, হঠাৎ ত্বক তৈলাক্ত হয়ে গেলে, আন্ডারআর্ম বা ঘাড়ে চামড়া মোটা হয়ে তাতে পিগমেন্টেশন হলে, শরীরে মেল প্যাটার্ন হেয়ার গ্রোথ বেশি হলে তা হতে পারে পিসিওএস-এর প্রাথমিক লক্ষণ। আবার পিসিওএস-এ অনেকের মাথার সামনের দিকে টাক পড়তেও পারে। এগুলির কোনও একটি দেখা দিলে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

পিসিওএস-এর নেপথ্যে থাকে জিনপিসিওএস-এর ক্ষেত্রে সাধারণত জেনেটিক প্রি-ডিসপোজিশন থাকে। অর্থাৎ যাঁদের পরিবারে পিসিওএস-এর জিনগত ইতিহাস নেই, শুধুমাত্র সেডেন্টারি জীবনযাপনের কারণে তাঁদের এই অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা খুব কম। এ কথা ঠিক যে, সেডেন্টারি জীবনযাপন পিসিওএস-এর লক্ষণগুলিকে প্রকট করে দ্রুত। যাঁরা সারাদিন বসে বসে কাজ করেন, হাঁটাচলা বা এক্সারসাইজ করেন না, উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাওয়াদাওয়া বেশি করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে উপসর্গ দেখা দেয় সহজে। আবার জেনেটিক প্রি-ডিসপোজিশন থাকলেও যদি কেউ নিয়ম মেনে জীবনযাপন করেন, তা হলে এর উপসর্গ তুলনায় কম প্রকাশ পাবে। পিসিওএস-এর মূল লক্ষণই হল অনিয়মিত পিরিয়ডস। এর পাশাপাশি ওজন বেড়ে যাওয়া, মুখে অতিরিক্ত হেয়ার গ্রোথ, অ্যাকনেও হতে পারে। এর পরে, আলট্রাসাউন্ড করলে বোঝা যায় ওভারিতে ছোট ছোট সিস্ট আছে। রক্তপরীক্ষা করলে হরমোনাল ইমব্যালান্স ধরা পড়ে।



কেমন হবে জীবনযাপন?পিসিওএস নিয়ন্ত্রণে রাখার মূল উপায়ই হল, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন। অতএব, এক্সারসাইজ আর খাওয়াদাওয়ার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য প্রয়োজন। সুপার প্রসেসড ফুড অর্থাৎ চিপস, চকলেট বা বিস্কিটের মতো প্যাকেটজাত খাবার যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। বদলে ফ্রেশ কুকড ফুড খান। রিফাইন্ড কার্বসের বদলে হোলগ্রেন কার্বস খান। অর্থাৎ, আটা, মিলেট, কিনোয়া ডায়েটে রাখুন। ময়দা এড়িয়ে চলুন। মাছ, মাংস, ডিম সবই চলতে পারে। তবে তেল ও চিনির পরিমাণ সীমিত রাখা প্রয়োজন। এই পুরো ডায়েট রেজিমের উদ্দেশ্য দুটোই: ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ও হরমোনের ব্যালান্স রক্ষা করা। শরীরে ক্যালরি ডেফিসিট তৈরি হলে তবেই ওজন কমবে। কারণ, তখনই শরীর ফ্যাট রিজার্ভ ব্যবহার করবে এনার্জির জন্য। ক্যালরি আউটপুট বাড়ানো জরুরি ও তার জন্য এক্সারসাইজরে প্রয়োজন। আপনি হাঁটুন বা জিম করুন, এক্সারসাইজে ধারাবাহিকতা রাখা প্রয়োজন।

স্ট্রেসের সঙ্গে সরাসরি পিসিওএস-এর যোগের কথা প্রমাণিত হয়নি। তবে স্ট্রেসের ফলে ইমোশনাল ইটিং করেন অনেকে। এর ফলে আবার ওজন বাড়তে পারে। তখন পিসিওএস-এর উপসর্গ দেখা দেয়।

লিন পিসিওএস-এ ওজন বাড়ে না

'লিন পিসিওএস'-এর ক্ষেত্রে অসুখটির অন্যান্য লক্ষণ থাকলেও ওজন বাড়ে না। তাঁদের আলাদা করে ওজন কমানোর পরামর্শ দেওয়া না হলেও পিরিয়ডস যাতে নিয়মিত হয় তার জন্য এক্সারসাইজ করতে বলা হয়। দু'আড়াই মাস টানা পিরিয়ডস না হলে ওষুধ দিতে হতে পারে। অনেকে আছেন, যাঁরা এক বছর পিরিয়ডস না হলেও চিকিৎসা করান না! তাঁদের ক্ষেত্রে এন্ডোমেট্রিয়াম মোটা হয়ে তা প্রি-ক্যানসারাস স্তরে পৌঁছোতে পারে। ফলে, পিসিওএসের লক্ষণ থাকলে ফেলে রাখবেন না।

পিসিওএস ও অন্যান্য অসুখ

পিসিওএস মূলত লাইফস্টাইল ডিসঅর্ডার। দ্রুতগতির জীবনে অনেকেই নাইট শিফ্‌ট করেন, তাঁরা রাতে জেগে দিনের বেলা ঘুমোন। এর ফলে তাঁদের হোমিয়োস্ট্যাটিক মেকানিজম ঘেঁটে যায়। মস্তিষ্ক, পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, হাইপোথ্যালামাস...অর্থাৎ যা কিছু আমাদের মেনস্ট্রুয়াল সাইক্‌ল ও ফার্টিলিটিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার কাজকর্ম ব্যাহত হয়। রাত দশটা থেকে ভোর চারটে অবধি সময়টুকুতে আমাদের শরীরের যাবতীয় মেরামতি ঘটে। ওই সময়টার বেশিরভাগই যদি কেউ জেগে থাকেন, তা হলে শরীরের রিজেনারেশন প্রসেস ব্যাহত হবে, স্বাভাবিক ভাবেই! ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোনের অনুপাতও ঘেঁটে যায়।

ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হতে পারে পিসিওএস-এর কারণে। অর্থাৎ, আমাদের শরীর বেশি পরিমাণে ইনসুলিন উৎপাদন করলেও তা ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। শরীর গ্লুকোজ ও ফ্যাট অ্যাবজর্ব করতে থাকে, ফলে ওবিসিটি দেখা দেয়। আবার অতিরিক্ত ইস্ট্রোজেনের ফলে ত্বকের পেরিফেরাল লেয়ারে অতিরিক্ত মেদ জমতে শুরু করে। ইস্ট্রোজেন মেল হরমোনে রূপান্তরিত হওয়ায় মেল প্যাটার্ন হেয়ার গ্রোথ ও টাক পড়তে পারে।

ওবিসিটির কারণে পিসিওএস হয়, আবার পিসিওএস-এর ফলে ওজন বাড়ে। ওবিসিটি ও ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কারণে পরবর্তীকালে ডায়াবিটিসও হতে পারে। ওবিসিটির ফলে উচ্চ রক্তচাপ ও ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ হতে পারে।

পিসিওএস ও মানসিক স্বাস্থ্য

ওজন বাড়ার ফলে বডি ইমেজ নিয়ে অনেকে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তবে শুধু তার ফলেই যে ডিপ্রেশন হয়, তেমনটা নয়। রাত জাগার ফলেও অ্যাংজাইটি ও স্লিপ ডিসঅর্ডার হতে পারে। এর ফলে অনেকেই বর্ডারলাইন ডিপ্রেশনেও ভোগেন। ঘুমের সঙ্গে অ্যাংজাইটির সরাসরি যোগ আছে। জীবনযাপনে পরিবর্তন আনলে মানসিক স্বাস্থ্যও ভাল রাখা সম্ভব।

পিসিওএস সারে না, এটি পুরোপুরি সঠিক ধারণা নয়। জীবনযাপন উন্নত হলে, পিসিওএস-এর উপসর্গগুলি প্রকাশ্যে আসবে না। ফলে, তা জীবনে জটিলতা তৈরি করবে কম। পাশাপাশি, পিসিওএস-এর সমাধানে এক্সোটার্নাল হরমোন ও ওষুধ দিতে হতে পারে। কিন্তু অনেকেই আছেন যাঁরা ওষুধ খেয়েও পিসিওএস নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, কারণ তাঁদের রাত জেগে কাজ করতে হয়।

আক্কেল দাঁত কখন তোলা উচিত পরবর্তী করণীয়

ডা. মেহেদী হাসান শিবলী



আক্কেল দাঁত ওঠার যন্ত্রণা অনেকের ক্ষেত্রেই ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকের আবার আক্কেল দাঁত তুলে ফেলারও প্রয়োজন হয়। মুখের ভেতরে বেকায়দায় কোনো জায়গায় দাঁত ওঠা, ব্যথা, ক্যাভিটি, প্রদাহ, আক্কেল দাঁত সংলগ্ন অন্য কোনো দাঁত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি কারণে এই দাঁত তুলে ফেলার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ ধরনের কোনো সমস্যা দেখা দেওয়ার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আক্কেল দাঁত তুলে ফেলা প্রয়োজন কিনা তা পর্যাপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষত মেক্সিলোফেসিয়াল সার্জন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

আক্কেল দাঁত কি?

অনেকে মনে করেন 'আক্কেল দাঁতের' সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধি বা আক্কেলের সম্পর্ক রয়েছে। তবে এর সঙ্গে কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই। সাধারণত ১৭-২৫ বছরের মধ্যে উপরের ও নিচে উভয় চোয়ালের তৃতীয় বা দাঁতগুলো উঠে। এমন দাঁতের সংখ্যা ৪টি যাদের মেডিকেলের পরিভাষায় বলা হয় 'থার্ড মোলার টুথ'।

কখন ব্যথা হয়?

বেশিরভাগ দাঁত ওঠার সময় ব্যথা অনুভূত না হলেও আক্কেল দাঁত বা থার্ড মোলার টুথ ওঠার ক্ষেত্রে অনেকের ব্যথার অনুভূতি হয়। প্রতিটি দাঁত উঠতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন হয়। অনেকের ক্ষেত্রে দাঁত ওঠার সময় জায়গায় অভাব হয় যেমন-চোয়াল ছোট বা অতিরিক্ত দাঁতের উপস্থিতি বা সঠিক স্থানে দাঁত না ওঠা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান না হলে দাঁত ওঠার সময় তার চারপাশে যে চাপ প্রয়োগ করে তাতে ব্যথা অনুভূত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যথা স্বাভাবিক মাত্রার ভেতর থাকে তবে ক্ষেত্রবিশেষে ইনফেকশন বা প্রদাহজনিত পরিস্থিতিতে আরও গুরুতর করে তোলে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে।

দাঁত কখন তোলা হয়?

যে কোনো দাঁত তোলার ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কেননা সময়ের আগে দাঁত পড়ে যাওয়া বা দাঁত তুলে ফেলার ফলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- দাঁত আঁকাবাঁকা হওয়া, সঠিক স্থানে দাঁত না ওঠা অথবা প্রয়োজনীয় স্থান সংকুচিত হয়ে দাঁত উঠতে বাধাগ্রস্থ হওয়া ইত্যাদি। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ, পর্যাপ্ত বয়স, ইনফেকশন বা প্রদাহের উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পন্নের পর দাঁত তোলা যেতে পারে।

আক্কেল দাঁত কখন তোলা হয়?

আক্কেল দাঁত বা যেকোন দাঁত উঠতে সমস্যা হওয়া, ইনফেকশন বা প্রদাহের উপস্থিতি, প্রয়োজনীয় স্থানের অভাব বা কোন টিউমার বা সিস্টের উপস্থিতি থাকলে সাধারণত দাঁত তুলে ফেলার প্রয়োজন হয়। দাঁত তোলার দুটি পদ্ধতি আছে। সার্জিকাল এবং নন সার্জিকাল। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে একজন অভিজ্ঞ ডেন্টাল সার্জন উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা সঠিকভাবে মেনে চলার দ্বারা চিকিৎসা পরবর্তী যেকোনো জটিলতা সহজেই এড়ানো যায়।

কখন আক্কেল দাঁত সার্জারির প্রয়োজন হয়

যেকোনো দাঁত তোলার ক্ষেত্রেই সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে। দাঁতের গঠন কাঠামো অস্বাভাবিক হলে, স্বাভাবিক পন্থায় (নন সার্জিকাল) দাঁত তোলা না গেলে অথবা দাঁত যদি অর্ধেক বা পুরোপুরি মাড়ি বা চোয়ালের হাড়ের ভেতর অবস্থান করে তখন দাঁত তুলতে সার্জারির প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ চিকিৎসকের পাশাপাশি রোগীকেও সার্জারির পূর্বে ও পরে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা আন্তরিকতার সঙ্গে মেনে চলা জরুরি।

দাঁত তোলার পরবর্তী করণীয়

সাধারণত দাঁত তোলার পর ২৪ ঘণ্টা নরম খাবার খাওয়া, গরম খাবার এড়িয়ে চলা, পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা লবন পানি দিয়ে কুলকুচি করা বা মাউথওয়াশ ব্যবহার করা ও অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের দ্বারা অধিকাংশ জটিলতা কেটে যায়। তবে সার্জিকাল এক্সট্রাকশনের ক্ষেত্রে সাময়িক সময়ের জন্য মুখ পরিপূর্ণ হা করতে বা জোরে হাসতে নিষেধ করা হয়। কারণ তাতে করে সেলাই ছুটে যাওয়া বা পুনরায় রক্তপাত হবার আশঙ্কা থাকে। তবে জটিলতা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় সেক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যেমন ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জনের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি।

মস্তিষ্কের মানচিত্রে নারী-পুরুষ



চিকিৎসা সাময়িকী ডেস্ক

একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবাধিকারের অগ্রগতির পরও নারী ও পুরুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক পার্থক্য নিয়ে বিতর্ক থেমে নেই। কে বেশি বুদ্ধিমান, কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কার বিশ্লেষণ ক্ষমতা শক্তিশালী এই প্রশ্নগুলো যুগে যুগে সমাজে ঘুরে ফিরে এসেছে। অথচ বাস্তবতা বলছে, আজ নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহাকাশ গবেষণায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় ও জটিল বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে; আবার পুরুষরাও সমান দক্ষতায় কাজ করছেন পরিচর্যা, শিল্পকলা ও গৃহস্থালির সৃজনশীল ক্ষেত্রে।

তবুও প্রশ্ন থেকেই যায় এই পার্থক্যগুলো কি আসলেই মস্তিষ্কের গঠনের কারণে? নাকি সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষা ও অভ্যাসই এখানে মূল ভূমিকা রাখে? আধুনিক নিউরোসায়েন্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এই পুরোনো প্রশ্নকে নতুন আলোয় বিশ্লেষণ করছে।

উনিশ ও বিশ শতকের শুরুর দিকে বিজ্ঞানীরা মানুষের মাথার খুলির আয়তন ও মস্তিষ্কের ওজন পরিমাপ করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেনড়াড়ে পুরুষের মস্তিষ্ক নারীদের তুলনায় কিছুটা ভারী। এখান থেকেই জন্ম নেয় বহুল আলোচিত 'মিসিং ফাইভ আউন্স' তত্ত্ব, যেখানে দাবি করা হয় নারীদের মস্তিষ্কের ওজন কম হওয়ায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতাও কম। তবে আধুনিক গবেষণা এই ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করেছে।

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী New Scientist এবং Nature Neuroscience-এ প্রকাশিত গবেষণাগুলো স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে-

মস্তিষ্কের ওজন বা আয়তনের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। শরীরের আকার বড় হলে মস্তিষ্কের আয়তন স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বড় হয়। প্রাণিজগতেও একই নিয়ম প্রযোজ্য-বড় দেহ ≠ বেশি বুদ্ধি

অর্থাৎ, মস্তিষ্কের গঠন নয়, বরং মস্তিষ্কের কার্যকর সংযোগ (neural connectivity) এবং অভিজ্ঞতাই বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা নির্ধারণ করে।

সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের Stanford University School of Medicine-এর একদল গবেষক মস্তিষ্কের স্ক্যান বিশ্লেষণে Artificial Intelligence (AI) ব্যবহার করছেন। এই গবেষণার নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্ট্যানফোর্ড মেডিসিনের মনোরোগ ও আচরণগত বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. বিনোদ মেনন।

তবে গবেষকদের উদ্দেশ্য নারী-পুরুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ-তা নির্ধারণ করা নয়। ড. মেননের ভাষায়, আমাদের মূল লক্ষ্য হলো মস্তিষ্কের বিকাশ, বার্ধক্য এবং স্নায়বিক ও মানসিক রোগে লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্যগুলো বোঝা, যাতে চিকিৎসা আরও কার্যকর করা যায়।

কিছু নির্দিষ্ট স্নায়বিক রোগ পুরুষদের মধ্যে তুলনামূলক বেশি দেখা যায়, যেমনঃ

অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, পারকিনসন ডিজিজ

অন্যদিকে নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়-

মাল্টিপল স্কলেরোসিস, ডিপ্রেশন ও উদ্বেগজনিত রোগ

গবেষকদের মতে, এই পার্থক্যগুলো বোঝা গেলে ভবিষ্যতে লিঙ্গভিত্তিক নির্ভুল চিকিৎসা (precision medicine) সম্ভব হবে।

'সেক্স ডিফারেন্স' বিতর্ক ও সমালোচকদের অবস্থান

তবে এই গবেষণাগুলো নিয়ে সমালোচনাও কম নয়। ব্রিটিশ নিউরোসায়েন্টিস্ট ও Aston University Brain Centre-এর ইমেরিটাস অধ্যাপক জিনা রিপন, তাঁর আলোচিত বই The Gendered Brain এবং The Guardian-এ প্রকাশিত লেখায় সতর্ক করেছেন- বর্তমানে একটি 'সেক্স ডিফারেন্স অ্যাজেন্ডা' তৈরি হয়েছে, যেখানে সামাজিক বৈষম্যকে বৈজ্ঞানিকভাবে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তা স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় নয়।

নারী ও পুরুষের মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে চিকিৎসা ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে। তবে গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা প্রয়োজন।

একদিকে যেমন চিকিৎসার প্রয়োজনে পার্থক্য বোঝা জরুরি,

অন্যদিকে সেই পার্থক্যকে ব্যবহার করে সামাজিক বৈষম্য, বৈরিতা বা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করা অনুচিত।

বিজ্ঞান আমাদের শেখায় মানুষের সম্ভাবনা লিঙ্গ দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। আর মানবিকতা শেখায় সমতা মানে সুযোগের সমতা, মর্যাদার সমতা এবং সম্মানের সমতা।

প্লাস্টিককণা জমে গজাচ্ছে টিউমার! ৯০ শতাংশ প্রস্টেট ক্যানসারের রোগীর রক্তে মিলল মাইক্রোপ্লাস্টিক

রক্তে প্লাস্টিকের কণা পাওয়া গিয়েছে আগেই। মানুষের মস্তিষ্কেও প্রবেশ করেছে তারা। এমনকি, মায়ের গর্ভেও প্লাস্টিকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণা বা মাইক্রোপ্লাস্টিকের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। আর এখন বিপদ নাকি আরও বেড়েছে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুতেও ঢুকে পড়েছে প্লাস্টিক। শুক্রাশয়ে এত পরিমাণ প্লাস্টিকের কণা যে জমা হতে পারে, তা চিন্তারও বাইরে।



ক্যানসার কোষেও ঢুকে পড়েছে প্লাস্টিকের কণা? না কি গুঁড়ো প্লাস্টিক জমেই তা ক্যানসারের রূপ নিচ্ছে? গবেষকেরা জানিয়েছেন, প্রস্টেট ক্যানসারের জন্যও দায়ী হতে পারে মাইক্রোপ্লাস্টিকই। ৯০ শতাংশ এমন রোগীর রক্তে প্লাস্টিকের কণাই পাওয়া গিয়েছে।

রক্তে প্লাস্টিকের কণা পাওয়া গিয়েছে আগেই। মানুষের মস্তিষ্কেও প্রবেশ করেছে তারা। এমনকি, মায়ের গর্ভেও প্লাস্টিকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণা বা মাইক্রোপ্লাস্টিকের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। আর এখন বিপদ নাকি আরও বেড়েছে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুতেও ঢুকে পড়েছে প্লাস্টিক। শুক্রাশয়ে এত পরিমাণ প্লাস্টিকের কণা যে জমা হতে পারে, তা চিন্তারও বাইরে। এমনই জানিয়েছেন নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা। একটি গবেষণায় প্রায় ৯০ শতাংশ প্রস্টেট ক্যানসারের রোগীর রক্তে ও টিউমার কোষে পাওয়া গিয়েছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। এই প্লাস্টিক শরীরে জমা হয়ে তা ক্যানসারের রূপ নিয়েছে বলেই ধারণা গবেষকদের।

আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজ়িজ় প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল (সিডিসি)-এর গবেষণাও চমকে দেওয়ার মতোই। গবেষকেরা জানাচ্ছেন, প্রস্টেট ক্যানসার হয়েছে, এমন রোগীর শরীরে তৈরি টিউমার কোষের নমুনা নিয়ে তা বিশ্লেষণ করা হয়। দেখা যায়, প্রতি গ্রাম কোষে অন্তত ৪০ মাইক্রোগ্রামের বেশি মাইক্রোপ্লাস্টিক জমা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, গোটা টিউমারটিতে সেই হিসেবে কী পরিমাণ প্লাস্টিকের কণা রয়েছে। রক্তে এক বার মাইক্রোপ্লাস্টিক ঢুকে গেলে, তা বিভিন্ন অঙ্গে যে সহজে পৌঁছে যেতে পারে, তা বোঝা কঠিন নয়। বিপদ সেখানেই।

এই গবেষণাটির সমীক্ষায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কারও শরীরে পাওয়া গিয়েছে পেট প্লাস্টিক যা দিয়ে তৈরি হয় ঈানিরবোতল, কারও শরীরে মিলেছে পলিস্টেরাইন, যা থাকে খাবারের কন্টেনারে। আবার কয়েক জন রোগীর রক্তে পাওয়া গিয়েছে পলিইথাইলিন, যা দিয়ে তৈরি হয় প্লাস্টিকের ছোট ব্যাগ। এক-এক জনের শরীরের রক্তে আবার দু'-তিন রকমের প্লাস্টিকও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কী ভাবে তা রক্তে প্রবেশ করছে, এখনও গবেষণাসাপেক্ষ।

ঈানিরবোতল, খাবারের প্যাকেট, দুধের প্যাকেট থেকে শুরু করে প্রসাধন সামগ্রী, এমনকি প্রাণদায়ী ওষুধও বিকোচ্ছে এখন প্লাস্টিক কন্টেনারে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্লাস্টিকের কণা শরীরে ঢুকে পড়ছে। এর আগেও ৫০ মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিকের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও তা বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছে পাড়ার দোকানে, গৃহস্থালিতে। আর এখন তা পেরিয়ে মানুষের রক্তে, কোষে-কলায়।

মাইক্রোপ্লাস্টিক দিনের পর দিন শরীরে ঢুকে রক্তে মিশতে থাকলে তা শুধু ক্যানসার নয়, আরও নানা জটিল রোগের কারণ হয়ে উঠতে পারে। প্লাস্টিকের কণা রক্তে মিশে ইনসুলিনের ক্ষরণে প্রভাব ফেলে। যা পরবর্তী সময়ে ডায়াবিটিসের কারণ হয়ে উঠতে পারে। শুধু তা-ই নয়, প্লাস্টিক শরীরে হরমোনের ভারসাম্যও বদলে দিতে পারে। আর জনন কোষ যদি প্লাস্টিকের কবলে পড়ে, তা হলে প্রজননের প্রক্রিয়াই ব্যাহত হবে, তেমনই জটিল রোগ নিয়ে জন্মাবে শিশু।



ম্যারেজ ফিট মুভস

চিকিৎসা সাময়িকী ডেস্ক

বিয়ে জীবনে একবারই, তাই এই দিনটি মেমোরেবল করে রাখতে সবাই কমবেশি চেষ্টা করে। একটা সুন্দর ফটোসেশান করে ক্যামেরা বন্দী করে রাখতে চায় সবাই এই স্পেশাল ডে-টিকে। এই স্পেশাল দিনটিকে মেমোরেবল করে তোলার পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিয়ের পোশাক। কারও কারও আবার পোশাকের প্রতি-ই অধিক গুরুত্ব থাকে কিন্তু অনেকের জন্য পছন্দমত পোশাকটা পাওয়া বাধা হয়ে দাড়ায় শরীরের আকারের জন্য। তাই অনেকেই শরীর গড়ার দিকে আগে থেকে মনোযোগ রাখেন। এ ক্ষেত্রে শুধু ডায়েটই যথেষ্ট নয়, পরিকল্পিত ওয়ার্কআউট ও ফিটনেস রুটিন অনেক জরুরি।

বিশেষজ্ঞদের মতে শুধু মনমতো পোশাকের জন্যই নয়, বিয়ে ঘিরে বর-কনের ওয়ার্কআউট করা এমনেতেও দরকার। তা বুঝতে বৈজ্ঞানিক কারণ এবং ফিটনেস বক্তব্য জেনে নেওয়া ভালো।

শুধু কার্ডিও এক্সারসাইজ করলেই হয়ে জাবে'ড়এই মনোভাবে চললে শরীরের পেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নিয়মিত রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিং বা ওয়েট নিয়ে বেয়াম পেশি বৃদ্ধিতে কার্যকরের পাশাপাশি মেটাবলিজমও বাড়ায়। দেখা গেছে, রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিংয়ের ফলে শরীরে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এর সঙ্গে স্ট্রেন্থ ওয়ার্কআউট যোগ করলে ফ্যাট লস ও পেশিরক্ষার সম্ভাবনা বাড়ে।

সেলিব্রিটি ট্রেইনার ইয়াসমিন করাচিওয়ালা বলেন, ওয়ার্মআপ ও ডাইনামিক স্ট্রেচিং দিয়ে শরীর প্রস্তুত করা জরুরি। সুতরাং সঠিক ওয়ার্কআউট করলে পেশি গঠন ও টোনিং হবে, শরীরে সুন্দর আকৃতি ফুটে উঠবে, মেটাবলিজম হাই থাকবে, অর্থাৎ বিশ্রামের সময়ও বেশি ক্যালরি বার্ন হবে। ফলে পোশাক ভালোভাবে বসবে, ফিটিং ঠিক হবে।

যারা বিয়ের আগে ওয়ার্কআউট পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য সময়, শারীরিক অবস্থা এবং লক্ষ্য বুঝে একটি হারমোনাইজড পরিকল্পনা দরকার। আসুন জেনে নি এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত।

স্কোয়াট

এ বেয়ামে একসঙ্গে একাধিক পেশি কাজ করে। স্কোয়াট করলে উরুর সামনে ও উরুর পেছনে গ্লুটাস (নিতম্ব) এবং পায়ের অন্যান্য পেশি সক্রিয় হয়। স্কোয়াটের সঙ্গে সার্বিক ব্যায়াম, সঠিক খাদ্য ও পর্যাপ্ত বিশ্রাম যুক্ত হলে আপনি একটি ওয়েল সেপ্‌ড শরীর পেতে পারেন। ফলে বিয়ের সময় কাপড়ে আপনাকে ভালো দেখাবে। পেশি গঠন ও শরীরের কার্ভ অংশের উন্নতি ঘটলে পছন্দের পোশাক শরীরে আরও সুন্দর ছাপ ফেলবে। শুধু স্কোয়াটেই সবাই একই ধরনের ফল পাবেন না; পার্থক্য তৈরি হতে

পারে বডি টাইপ, খাদ্যাভ্যাস, বংশগতি, বিশ্রাম ইত্যাদির কারণে।

লাঞ্জ

এই বেয়াম শরীরের গঠন উন্নত করে। বিশেষ করে নিতম্ব, উরু ও পায়ের পেশি সুন্দরভাবে গড়ে তুলে। ফলে বিয়ের দিন বর কিংবা কনের সাজে আপনার শরীর আরও ওয়েল সেপ্‌ড ও আকর্ষণীয় দেখাবে। লাঞ্জ এক্সারসাইজ পায়ের পেশি বিশেষভাবে মজবুত করে কোয়াডস, হ্যামস্ট্রিং ও গ্লুটস শক্তিশালী হয়। এটি পশ্চার ভালো করে শরীর সোজা ও সুষম রাখে। শরীরের নিচের অংশ সুগঠিত ও ফিট দেখায়। ক্যালরি বার্ন করে এই ব্যায়াম ওজন কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি স্ট্যামিনা বাড়ায় ।কয়েক রকম লাঞ্জ করতে পারেন যেমনঃ রিভার্স লাঞ্জ, সাইড লাঞ্জ, ওয়াকিং লাঞ্জ, জাম্পিং লাঞ্জ বহুল প্রচলিত। তবে চর্চার ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা জরুরি। শুরুতেই খুব বেশি এক্সারসাইজ করবেন না। মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ানো উত্তম। এবং স্ট্রেচিং এমনভাবে করবেন, যেন পেশিতে টান না পড়ে।

পুশআপ

পুশআপ এক্সারসাইজের ফলে বুকের গঠন উন্নত হয়, এটি বুকের পেশি শক্তিশালী করে এবং বুক উঁচু ও ফিট দেখায়। তা ছাড়া হাত ও কাঁধের শেপ ভালো হয়। বয়স বা ক্লান্তিভাব ছাড়াই হাত ও কাঁধে টান টান ভাব আসে। এর ফলে নিজেকে সুগঠিত ও আত্মবিশ্বাসী মনে হয়, যা বিয়ের দিনে চলাফেরায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। পুশআপ করলে শরীরের ওপরের অংশে পোশাক ফিটিং ভালো হয়। বিয়ের ৩০-৪৫ দিন আগে এর চর্চা শুরু করলে ভালো ফল মিলতে পারে। যদি নতুন হয়ে থাকেন পারছেন না ঠিকমত করতে, তাহলে প্রতিদিন ৮-১০টি করে ২ সেট চর্চা করতে পারেন। পরে ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। অর্থাৎ ১৫-২০টি করে ৩ সেট। ভুলভাবে এর অনুশীলন করলে পিঠ বা কাঁধে ব্যথা হতে পারে। বেশি করলে এক দিন পর মাংসপেশিতে ব্যথা হতে পারে।

ডাম্বেল রো

এই দেহচর্চা শরীরের গঠন আরও সুন্দর ও ফিট করে তোলে। বিশেষ করে এটি পিঠ, কাঁধ ও বাহুর পেশি গঠনে সহায়ক। এর অনুশীলনের ফলে বিয়ের পোশাকে আরও আকর্ষণীয় ও সুগঠিত দেখানোর সম্ভাবনা বাড়ে। ডাম্বেল রোর উপকারিতার তালিকায় রয়েছে। এতে পিঠের গঠন ভালো হয়। ফলে সোজা ও সুগঠিত পিঠে যেকোনো পোশাক ভালো দেখায়। জামার হাতা বা স্লিভলেস পোশাকে ফিট বাহু ও কাঁধ চমৎকার লাগে। বিয়ের ছবি বা ভিডিওতে সোজা দাঁড়ানো ও চলাফেরায় সুন্দর দেখায়। চর্বি কমে এবং পেশি গঠিত হয়; ফলে শরীর ঝরঝরে দেখায়। শুরুতে হালকা ওজন (২-৫ কেজি) উত্তোলন করা উত্তম। পরে ধীরে ধীরে ভার বাড়াতে পারেন। ডাম্বেল রোর সঙ্গে স্কোয়াট, পুশআপ, বাইসেপ কার্লসহ আরও কিছু ব্যায়াম যুক্ত করলে পুরো শরীর সুন্দরভাবে গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। এতে বিয়ের যেকোনো পোশাকে আরও স্টাইলিশ দেখাবে।

ডেডলিফট

এর চর্চায় শরীর আরও সুগঠিত ও মজবুত হয়। বিশেষ করে পিঠ, কোমর, উরু ও নিতম্ব। এই ব্যায়াম সম্পূর্ণ শরীরের শক্তি ও কাঠামো ঠিক রাখতে সাহায্য করে। ডেডলিফট এক্সারসাইজ করলে কোমর ও পিঠ সোজা থাকে, ফলে পোশাকে আকর্ষণীয় দেখায়। পেছনের অংশ ও উরুতে টান পড়ে, ফলে শরীরের শেপ ভালো হয়। এর চর্চায় মেটাবলিজম বাড়ে; ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

বেয়ামের পাশাপাশি পুষ্টিবিদের পরামর্শ মেনে স্বাস্থ্যকর খাবার (প্রোটিন, শাকসবজি, পানি) গ্রহণ এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিলে আপনি ফলাফল আরও দ্রুত পাবেন। অতিরিক্ত স্ট্রেস এড়িয়ে চলবেন। শরীরচর্চায় শুধু শরীরের সৌন্দর্য বাড়ে না। আত্মবিশ্বাসও বাড়ে, যা বিয়ের দিন আপনাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। আপনার স্পেশাল দিনটি আরও স্পেশাল ও মেমোরেবল হয়ে থাকবে।

সকালে রক্তে সুগার বেশি, নিয়ন্ত্রণে রাখবেন যেভাবে

চিকিৎসা সাময়িকী ডেস্ক

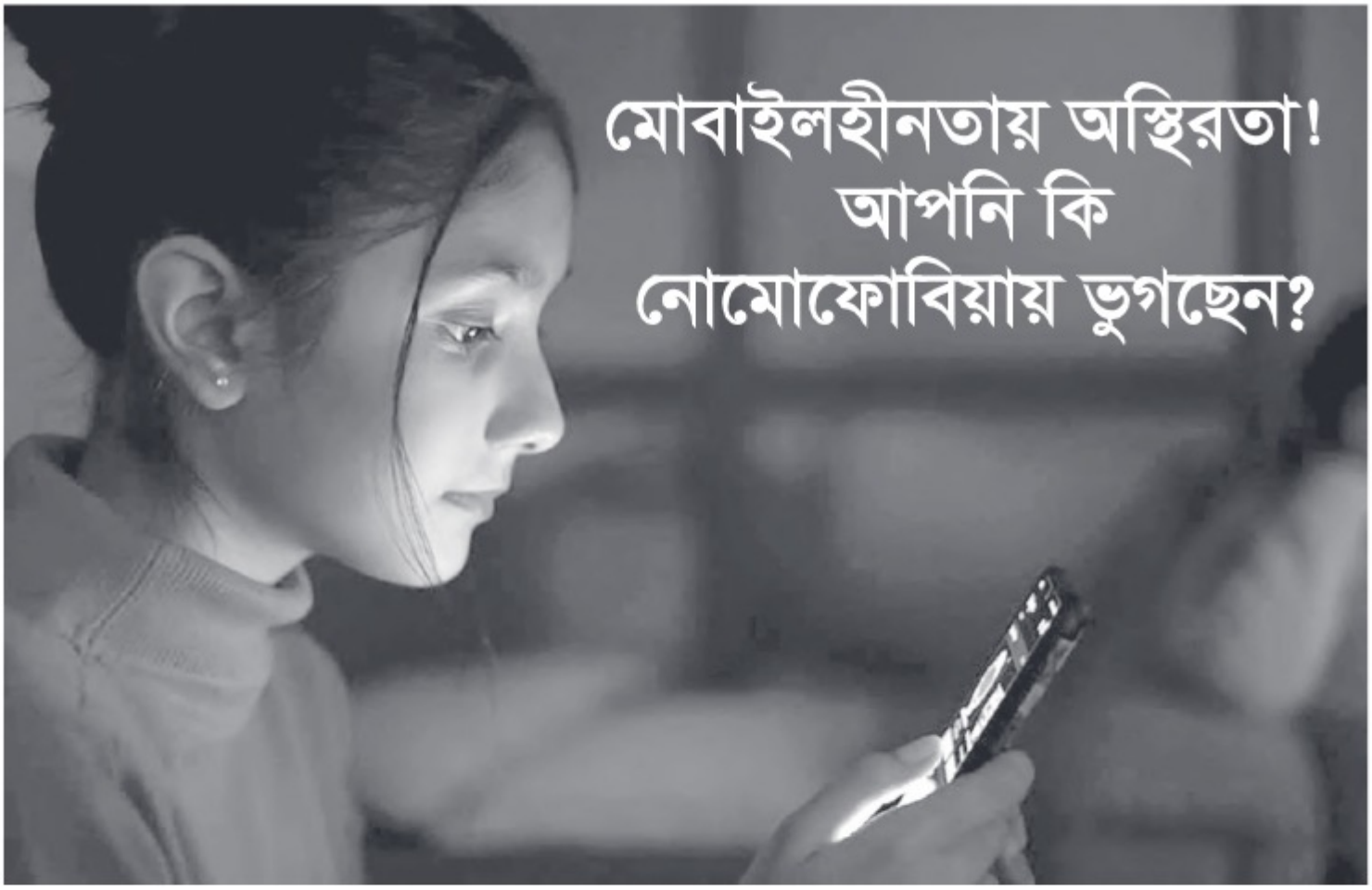
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার প্রথম লক্ষণ সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্লাড সুগার খুব বেশি থাকে। এমন হলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে যা করতে হবে:

* রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকলেও সকালের খাবার বাদ দিলে চলবে না, সকালে না খেলে সারাদিনে খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়
* পুষ্টিকর কিন্তু পরিমাণে কম খাবার খান। সকালের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বিকেলের নাস্তাটাও। আর রাতে কার্বোহাইড্রেট কম খাওয়ার চেষ্টা করুন
* ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যায়াম মাস্ট।

পারলে সন্ধ্যায় ব্যায়াম করুন

* ডিনার শেষে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাতে যাবেন না। কম করে হলেও দুই ঘণ্টা আগে রাতের খাবার খেয়ে নিন। সম্ভব হলে রাতে খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ হাঁটুন। এতে সকালে উঠে রক্তে শর্করার মাত্রা কম থাকবে
* সুস্থ থাকতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিয়মিত ডায়াবেটিসের ওষুধ খান।





মোবাইলহীনতায় অস্থিরতা! আপনি কি নোমোফোবিয়ায় ভুগছেন?

চিকিৎসা সাময়িকী ডেস্ক

আজকের দিনে প্রত্যেকের হাতেই একটি বা একাধিক মোবাইলফোন দেখা মিলবে। এমন বলা যায় যে মোবাইলফোন যেন মানুষের একটি ছোট অঙ্গ হয়ে গেছে। কারণ মোবাইলফোন ছাড়া আমাদের একটি মুহূর্তও চলে না। কোনো কারণে মোবাইলফোন হারিয়ে গেলে, বা নষ্ট হয়ে গেলে বুঝা যায় চিন্তা কাকে বলে। এমনি অনেকে আছো যাদের মোবাইলফোন হারিয়ে গেলে, বা কাছাকাছি না থাকলে এক ধরনের মানসিক অস্থিরতা, মানসিক চাপ তৈরি হয়। এ ধরনের অস্থিরতা যাদের হয় তাদের বলা হয় নোমোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি।

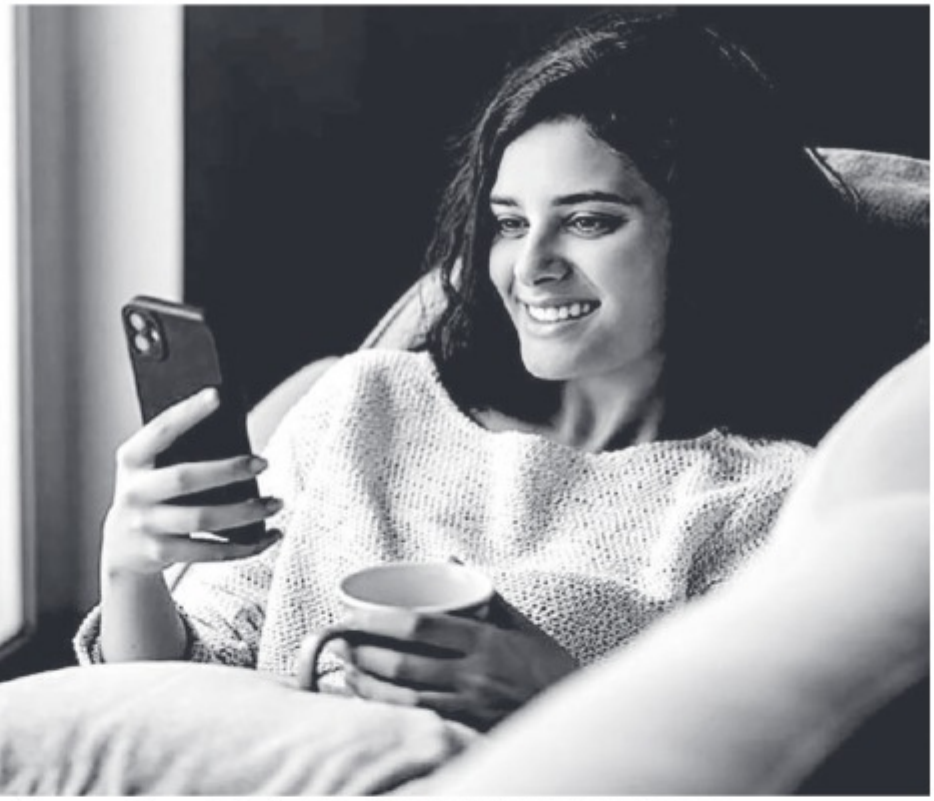
নোমোফোবিয়া (Nomophobia) যেটার পূর্ণরূপ হলো, নো-মোবাইল ফোবিয়া। এর উদাহরণ প্রায়-ই দেখতে পাবেন। মোবাইলটা হাতের সামনে না পেলে কেমন পাগলের মতো করবে এই ফোবিয়ায় যারা ভুগে। হলিউড মুভি জুমানিজ -২ তে দেখতে পাবেন একটি মেয়ে যখন জঙ্গলে ফেসে যায় তার সব কিছু হাড়িয়ে যায়, কিন্তু সে পাগলামি করে শুধু তার মোবাইলের জন্য। এই সমস্যার কথা আমরা অনেকেই না জানলেও, আমাদের মধ্যেই অনেকেই এই রোগের শিকার। রোগটির দুই ধরনের লক্ষণ রয়েছে মানসিক এবং শারীরিক। মানসিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে মোবাইল ফোন থেকে দূরে সরে গেলে হঠাৎ মনে ভয়, দুশ্চিন্তা কিংবা হতাশা ভর করা। হঠাৎ মোবাইল ফোন চোখের আড়ালে চলে গেলে আতঙ্কিত হয়ে যাওয়া। দীর্ঘ সময় মোবাইল ফোন চালাতে না পারলে মানসিক চাপ অনুভব করা। সাধারণত কোনো ভীতিকর পরিস্থিতিতে মানুষ যেসব শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ করে থাকে, এই রোগের ক্ষেত্রেও সেগুলোই প্রকাশ পায়। যেমন- হঠাৎ কাঁপতে শুরু করা কিংবা স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস বাধাগ্রস্ত হওয়া। এছাড়াও জ্ঞান হারিয়ে ফেলা অথবা কোনো আবহাওয়াগত কারণ ব্যতিরেকে ঘামতে থাকাও এই রোগের শারীরিক লক্ষণগুলোর মধ্যে একটি।

নোমোফোবিয়ায় আক্রান্ত মানুষেরা সাধারণত নানান সামাজিক সমস্যাতে ভোগেন। ফোন থেকে দূরে থাকলে এই রোগে আক্রান্তরা উদ্বেগে ভোগেন। যার ফলে উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া এর ফলে মনোযোগও নষ্ট হয়। যার ফলে কর্মস্থলে উৎপাদনশীলতাও কমে আসে। এছাড়া এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সময়ের অপচয় করে। নোমোফোবিয়ায় আক্রান্ত লোকেরা ত্বকের সমস্যায়ও আক্রান্ত হন। অনবরত ফোনের সংস্পর্শে থাকার ফলে ব্রন, অ্যালার্জি ও ডার্ক স্পট পড়তে পারে।

কেন এটি হয়?

বিশেষজ্ঞদের মতে, মোবাইল ফোনের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার ফলে একধরনের আসক্তি তৈরি হয় মানুষের মধ্যে যেটা হলো সব সময় মোবাইল ব্যবহার করা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগ আশার পর মোবাইল ফোনের উপর মানুষের আসক্তি আরও ১০গুন বেড়ে উঠেছে। হঠাৎ যখন একজন মোবাইল ফোনে আসক্ত ব্যক্তি অনুধাবন করেন যে তিনি মোবাইল ফোন হাড়িয়ে ফেলেছেন বা মোবাইল চালাতে পারছে না স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে বেশ কিছু মানসিক পরিবর্তন এসে পরে, যেটি তার জন্য মোটেও সুখবর নয়। আমাদের দেহের একটি অতি প্রয়োজনীয় হরমোন হচ্ছে ডোপামিন। এটিও নোমোফোবিয়ার পেছনে বেশ কিছুটা দায়ী।

নোমোফোবিয়া বর্তমানে পঞ্চম সংস্করণ (ডিএসএম-৫)-এ এটি একটি 'নির্দিষ্ট ভীতি' হিসেবে প্রস্তাবিত হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী



"বিশেষজ্ঞদের মতে, মোবাইল ফোনের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার ফলে একধরনের আসক্তি তৈরি হয় মানুষের মধ্যে যেটা হলো সব সময় মোবাইল ব্যবহার করা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগ আশার পর মোবাইল ফোনের উপর মানুষের আসক্তি আরও ১০গুন বেড়ে উঠেছে। হঠাৎ যখন একজন মোবাইল ফোনে আসক্ত ব্যক্তি অনুধাবন করেন যে তিনি মোবাইল ফোন হাড়িয়ে ফেলেছেন বা মোবাইল চালাতে পারছে না স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে বেশ কিছু মানসিক পরিবর্তন এসে পরে, যেটি তার জন্য মোটেও সুখবর নয়।"

Adriana Bianchi and James G. Philips তাঁদের জার্নাল Psychological Predictors of Problem Mobile Phone Use-এ বলছেন, কিছু মানসিক কারণ মোবাইলফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত আছে। এই মানসিক কারণগুলোর মধ্যে ব্যক্তির আত্মসম্মানের অভাব (যখন আশ্বস্ত ব্যক্তিরা অনুপযুক্ত উপায়ে মোবাইলফোন ব্যবহার করে) এবং বহির্মুখী (এক্সট্রোভার্ট) ব্যক্তিত্ব (যখন স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক ব্যক্তিরা মোবাইলফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার করে) অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক ফোবিয়া বা সামাজিক উদ্বেগ ব্যধি, সামাজিক উদ্বেগ এবং প্যানিক ডিসঅর্ডারের মতো সমস্যাগুলোও তাদের মধ্যে দেখা যায় এবং পূর্বের মানসিক ব্যধিগুলোর কারণে মনস্তাত্ত্বিক উপসর্গগুলোও হতে পারে।

২০০৮ সালের United kingdom-এর গবেষণা সংস্থা ওএড়া-এর গবেষণায় দেখা যায় যে, ব্রিটেনে প্রায় ৫৩% মোবাইলফোন ব্যবহারকারী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যখন তারা 'তাদের মোবাইল ফোন হারায়, ব্যাটারি বা ক্রেডিট ছাড়ায়, বা কোনও নেটওয়ার্ক কভারেজ থাকে না'। গবেষণায় ২ হাজার ১৬৩ জন লোকের নমুনা থেকে পাওয়া গেছে, প্রায় ৫৮% পুরুষ এবং ৪৭% নারী ভয়াবহভাবে ভুগছেন এবং অতিরিক্ত ৯% লোক মোবাইলফোন বাড়িতে রেখে আসার কারণে মানসিক চাপে পড়েন। জরিপের ৫৫% লোক উল্লেখ করেছেন যে, তারা মোবাইলফোন বাড়িতে রেখে আসার কারণে তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের যোগাযোগ রাখতে পারেন না। এই বিষয়টি তাদের মানসিক উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আমেরিকায় মোট মোবাইলফোন ব্যবহারকারীর প্রায় ৬৬ শতাংশ ব্যক্তিই তাদের মধ্যে নোমোফোবিয়ার লক্ষণগুলো বিদ্যমান থাকার কথা স্বীকার করেছেন। বাসায় মোবাইল ফোন রেখে আসা ৫০ শতাংশ ব্যক্তি মানসিক অস্বস্তিতে ভুগে থাকেন।এমনকি ২৬ শতাংশ সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষেত্রে চালকেরা দুর্ঘটনায় সময় মোবাইলফোন ব্যবহার করে থাকেন বলে পরিসংখ্যান দেখা গিয়েছে। ৬৯ শতাংশ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী ঘুম থেকে উঠে কোনো কাজ করার আগে সবার প্রথমে মোবাইল ফোনে হাত দেন।

লক্ষণ

আপনি নোমোফোবিয়ায় আক্রান্ত যদি আপনি

১. রাতে প্রতি দুই ঘন্টা পরপর আপনার ফোন চেক করার জন্য জেগে ওঠেন।

২. দুপুরের খাবার বা রাতেও খাবার খাওয়ার সময়ও যদি আপনি ফোন চেক করেন।

৩. ফোনের ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং পুনরায় চার্জ না দেওয়া পর্যন্ত শান্ত হতে পারেন না।

৪. ফোনে কোনো সিগনাল না থাকলে আপনার এমন অনুভূতি হয় যে আপনার জীবনটাই বুঝি বৃথা।

৫. আপনি যত ব্যস্তই থাকেন না কেন ফোনে কল আসলে আপনি তা রিসিভ করার জন্য মুখিয়ে থাকেন।

৬. আপনি এমনকি ওয়াশরুমেও ফোন নিয়ে যান।

চিকিৎসানোমোফোবিয়া এখনো পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত কোনো রোগ নয়। তাই এই রোগ নির্ণয়ের জন্য যেসব বিশেষ কোনো পদ্ধতিও নেই এবং চিকিৎসাও নেই। তবে যেহুতু এটি একধরনের ফোবিয়া তাই ফোবিয়ার চিকিৎসা অর্থাৎ মোবাইলের প্রতি আসক্তিটা নিজ থেকে কমাতে হবে। ২০১৫ সালে আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষার্থী এই রোগ নির্ণয়ের জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করেছিলেন। প্রায় তিন শ শিক্ষার্থীর ওপর সেই প্রশ্নমালা প্রয়োগ করে সেই শিক্ষার্থীর সফলও হয়েছিলেন। সাধারণত যেসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, তারা যেকোনো ফোবিয়ার স্বাভাবিক লক্ষণগুলোর মাধ্যমেই রোগীর এই রোগ চিহ্নিত করে ফেলতে পারবেন। ওপরে যেসব লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেসব হঠাৎ দেখা দিলেই একজন মানুষ নোমোফোবিয়ায় আক্রান্ত, এমনটা বলা যাবে না। তবে যদি লক্ষণগুলো ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে টানা বিদ্যমান থাকে, সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উত্তম।



কেন একসঙ্গে একাধিক সন্তান গর্ভে আসে?

চিকিৎসা সাময়িকী ডেস্ক

প্রকৃতির নিয়মে সাধারণত একজন নারীর গর্ভে একটি সন্তানই বৃদ্ধি পায়। তবে মাঝে মাঝে একাধিক সন্তানও আসে যেমন যমজ, ত্রয়ী বা আরও বেশি। প্রতি ২৫০ জন মায়ের মধ্যে একজনের গর্ভে যমজ সন্তান আসে। আর তিন সন্তানের ঘটনা ঘটে প্রায় প্রতি ১০ হাজার গর্ভে একবার। একসঙ্গে চার সন্তান জন্মের ঘটনা আরও বিরল। প্রায় সাত লাখে একজনের ক্ষেত্রে ঘটে।যদিও এমন ঘটনা শুনতে আনন্দদায়ক, কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একাধিক সন্তান গর্ভে থাকা মানেই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা।

একাধিক সন্তান কেন হয়- স্বাভাবিকভাবে মাসে একজন নারীর দেহে একটি ডিম্বাণু পরিপক্ব হয়। একটি শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে সেটা ভ্রূণ তৈরি করে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি একটু ভিন্ন হয়।

একাধিক ডিম্বাণু পরিপক্ব হওয়া কখনও কখনও নারীর দেহে একাধিক ডিম্বাণু পরিপক্ব হয় এবং প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাদা ভ্রূণ তৈরি করে। এতে যমজ বা একাধিক সন্তান গর্ভে আসতে পারে। বন্ধ্যত্ব চিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু ওষুধও একাধিক ডিম্বাণু উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারে।

একটি ভ্রূণ বিভাজিত হওয়া- আবার কখনো একটি ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে তৈরি ভ্রূণ প্রাকৃতিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ফলে তৈরি হয় অভিন্ন যমজ সন্তান। যাদের চেহারা, রক্তের গ্রুপ, এমনকি বৈশিষ্ট্যও প্রায় একই রকম হয়।

গর্ভের শিশুর ঝুঁকি

একাধিক সন্তান থাকলে গর্ভাবস্থা সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন

গর্ভপাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

অনেক সময় গর্ভকাল পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রসব বেদনা শুরু হয় বা পানি ভেঙে যায়।

শিশুর মাথা আগে বের না হয়ে শরীরের অন্য অংশ বা নাড়ি বেরিয়ে আসার ঝুঁকি থাকে।

অপরিণত শিশুর ওজন কম হয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং অনেক সময় জন্মের পর নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (NICU) রাখতে হয়।

জন্মগত ত্রুটি বা গর্ভেই মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনাও থাকে।

গর্ভফুল বা প্লাসেন্টা সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিতে পারে।

মায়ের জন্য ঝুঁকি

শুধু শিশুই নয়, মা নিজেও নানা জটিলতায় পড়তে পারেন। যেমন

অতিরিক্ত বমি, দুর্বলতা ও রক্তস্বল্পতা।

অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি ও হাঁটাচলায় কষ্ট।

শ্বাসকষ্ট ও ঘুমের সমস্যা।

রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া বা প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়ার ঝুঁকি।- গর্ভাবস্থাজনিত ডায়াবেটিস।

প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ।

করণীয়

একাধিক সন্তান গর্ভে এলে অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

চিকিৎসকের নিয়মিত তত্ত্বাবধান - বিশেষজ্ঞ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়মিত চেকআপ করুন।

পুষ্টিকর খাবার ও পর্যাপ্ত পানি মায়ের শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তি ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্রাম ও হালকা ব্যায়াম -শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যায়াম করুন।

মানসিক যত্ন -গর্ভাবস্থায় মানসিক প্রশান্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সহযোগিতা ও ভালোবাসা মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রসবের প্রস্তুতি- এমন হাসপাতালে প্রসবের পরিকল্পনা করুন, যেখানে নবজাতকের নিবিড় পরিচর্যার (NICU) ব্যবস্থা আছে।

একাধিক সন্তান মানে একসঙ্গে দ্বিগুণ বা ততোধিক আনন্দ, তবে এর সঙ্গে বাড়ে দায়িত্বও। তাই শুরু থেকেই সচেতনতা, সঠিক চিকিৎসা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও মানসিক স্থিরতাই হতে পারে মা ও শিশুর নিরাপত্তার চাবিকাঠি।



দাঁতের যত্নে গাফিলতিতে বাড়তে পারে ক্যান্সারের ঝুঁকি

চিকিৎসা সাময়িকী ডেস্ক

"দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝতে শিখুন, নয়তো বিপদ ডেকে আনতে পারেন নিজের অজান্তেই" এই সতর্কবার্তা দিচ্ছেন দিল্লির এমস (AIIMS) এর চিকিৎসকেরা।

আমরা অনেকেই দাঁতের যত্নে খুব একটা গুরুত্ব দিই না। দাঁতে ব্যথা না থাকলে বা চোখে দেখা যাওয়ার মতো কোনো সমস্যা না হলে দন্ত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার কথা মনেও করি না। কিন্তু দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এমস) এর বিশেষজ্ঞদের মতে, দাঁতের প্রতি এই উদাসীনতাই বাড়িয়ে দিতে পারে ক্যানসারের ঝুঁকি।

এমস-এর চিকিৎসক ড. অভিষেক শঙ্কর ও ড. বৈভব সাহনি জানাচ্ছেন, দাঁত ও মাড়ির সমস্যাকে অবহেলা করলে তা শুধু মুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, শরীরের নানা জায়গায় ক্যানসারের জন্ম দিতে পারে। বিশেষত মুখগহ্বর, গলা, টনসিল, স্বরযন্ত্র, থাইরয়েড, নাক, সাইনাস, এমনকি খাদ্যনালির উপরিভাগ এসব জায়গার ক্যানসার যাকে বলা হয় 'হেড অ্যান্ড নেক ক্যানসার' তার উৎস হতে পারে মুখের ভেতরের স্বাস্থ্য অবনতি।

মুখেই বাসা বাঁধে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া

দাঁত বা মাড়িতে সংক্রমণ হলে মুখে জন্মাতে পারে দুই ধরনের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া Porphyromonas gingivalis ও Prevotella intermedia। এই ব্যাকটেরিয়াগুলো পরবর্তীতে ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। কারণ খাদ্য ও পানীয়তে থাকা বিভিন্ন রাসায়নিক লালা মিশে পেটেও প্রবেশ করে। মুখ পরিষ্কার না থাকলে এসব টক্সিন জমে গিয়ে শরীরে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

যেভাবে দাঁতের যত্ন নেবেন

দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখতে শুধুমাত্র নিয়মিত ব্রাশ করাই যথেষ্ট নয়। নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করলে মুখগহ্বর থাকবে ঝকঝকে, শরীর থাকবে সুস্থ।

অস্বস্তি বুঝলেই দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। দাতের ভিতরে কী সমস্যা হচ্ছে সেটা আপনি বুঝবেন না। কিন্তু চিকিৎসক পারবেন গোড়ায় গিয়ে ধরতে।

দাঁতের শিকড় বেরিয়ে গেলে বা শিরশির করলে গুরুত্ব দিন। এনামেল না থাকা অংশে সহজেই সমস্যা হয়, প্রয়োজন অনুযায়ী টুথপেস্ট বা ফিলিং করানো দরকার হতে পারে।

রাতে অবশ্যই ব্রাশ করুন। রাতে খাওয়া খাবার দাঁতে জমে থেকে ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে। তাই ঘুমানোর আগে ব্রাশ একান্ত প্রয়োজনীয়।

ছোটদের দাঁতের যত্ন শুরু করুন দুধের দাঁত উঠলেই তাদের কুলকুচি ও ব্রাশের অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই গড়ে তুলুন।

অপ্রয়োজনে মেডিকেটেড টুথপেস্ট ব্যবহার করবেন না। সাধারণ টুথপেস্টই যথেষ্ট, বিশেষ প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

গার্গল করাটা করুন অভ্যাসে। শুধু ঠান্ডা লাগা নয়। মুখের পিএইচ ব্যালেন্স ঠিক রাখতেও গার্গল প্রয়োজন। বিশেষ করে মিষ্টি বা ঠান্ডা পানীয় খাওয়ার পরে।

দাতে ফ্লস করুন নিয়মিত। সরু সুতোর সাহায্যে দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবার বের করে ফেলুন, অভ্যাসে রূপ দিন।

নরম ব্রাশ ব্যবহার করুন। নিয়মিত বদলান ব্রাশগুলো। প্রতিটি ব্রাশ ৩ মাস পরপর বদলানো উচিত। নরম ব্রাশ দাঁতের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ।

দাঁতের যত্ন মানে শুধু একটা সুন্দর হাসি নয় বরং এটা হতে পারে ভয়ংকর এক রোগ ক্যানসার থেকে দূরে থাকার চাবিকাঠি। তাই দাঁতের যত্নকে হালকাভাবে নেওয়া একদম উচিত নয়। সময় থাকতেই প্রতিরোধ করলেই দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব।

ঘরের কাজ মস্তিষ্কের সেরা ব্যায়াম! কী লাভ হয় এতে?

ঘরের সাধারণ কাজেই লুকিয়ে রয়েছে মন ভাল রাখার চাবিকাঠি? কী ভাবে তা হয়ে উঠতে পারে মস্তিষ্কের সেরা ব্যায়াম?

ঘরের কাজ কী এমন কাজ! কী এমন আছে এতে? এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় কম-বেশি অনেক গৃহিনীকেই। চাকরি, ব্যবসা বা পেশাজগতের নানা কাজকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়, তার বিন্দুমাত্র গুরুত্ব পায় না ঘরের কাজ। এই নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য যতই থাকড় এমন কাজই কিন্তু মন ভাল রাখার অন্যতম পন্থা হতে পারে। মনোবিদেরা বলছেন, "নিজের মনে হালকা কাজ করার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ভাল থাকার শর্ত। খুব বেশ ভাবনাচিন্তা না করে যে কাজ করা যায়, তা কিন্তু মন এবং শরীর, দুই-ই ভাল রাখতে পারে।"

ঘর গুছিয়ে রাখা, গাছে পানি দেওয়া, বইপত্র গুছিয়ে তোলা, বাড়ি পরিষ্কার রাখার মতো কাজে ভাবনাচিন্তার বিশেষ দরকার পড়ে না। বলা চলে অভ্যাসবশেই এই কাজগুলি করে ফেলতে পারেন যে কেউ। মস্তিষ্কের উপর চাপ প্রয়োগ না করে এমনই ঘরোয়া সাধারণ কাজই কিন্তু মানসিক চাপ কমাতে পারে। উদ্বেগেরও 'টোটকা' হয়ে উঠতে পারে।

দিল্লির এক হাসপাতালের মনোবিদ জেসমিন অরোরা সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন, ঘরের এমন সাধারণ কাজই ব্যক্তিবিশেষের কাছে 'থেরাপি'-র মতো হয়ে ওঠে। মন ভার হয়ে থাকা লাঘব করে, কোনও কারণে খুব চিন্তিত থাকলেও, ধীরে ধীরে মনকে শান্ত করে। তার কারণ হল, এই কাজগুলি মস্তিষ্কের প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর উপর প্রভাব ফেলে চাপ কমাতে সাহায্য করে।



অফিসের কাজ নিয়ে কিংবা পারিবারিক ভাবে কারও স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। এমন সময়, নিজের খেয়ালেই এলোমেলো জামাকাপড় গুছিয়ে নিতে পারেন, আলমারির অগোছালো তাকটা গুছিয়ে ফেলতে পারেন, কিংবা বাগান থাকলে গাছের পরিচর্যা করতে পারেন। কাজের মাধ্যমেই দুশ্চিন্তার প্রাবল্য ধীরে ধীরে কমবে। মন অন্য দিকে ঘুরবে। আসলে এর নেপথ্যে কাজ করে 'ডোপামিন'-এর মতো হরমোন, যা আনন্দ বা সুখানুভূতি তৈরি করে। ছোটখাটো কাজগুলি মস্তিষ্কে ডোপামিনের ক্ষরণ বাড়িয়ে তোলে। আবার 'কর্টিসল' নামক হরমনোন দুশ্চিন্তা, মনখারাপের কারণ হয়। সাধারণ সাংসারিক কাজ এক দিকে যেমন ডোপামিন নিঃসরণের মাত্রা বৃদ্ধি করে, তেমনই অন্য দিকে কর্টিসলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।

নতুন কোনও বিষয় শেখা, অভিজ্ঞতা তৈরি, কাজ করার নেপথ্যে থাকে মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষমতা, যাকে বলা হয় 'নিউরোপ্লাস্টিসিটি'। এটি মস্তিষ্কের নিউরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনেও সাহায্য করে। বয়স হলে মস্তিষ্কের এমন ক্ষমতা কমতে থাকে, অ্যালঝাইমারের মতো অসুখ দেখা যায় কারও। কিন্তু ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে বা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কাজ করার অভ্যাস বজায় রাখলে শরীর যেমন সচল থাকে, তেমনই মস্তিষ্কের ব্যায়ামও হয়।

যেমন নিজে হাতে বাগান পরিচর্যা, বিছানা পরিষ্কার রাখা, রান্নাঘর গুছিয়ে রাখার মতো কাজ করতে ভাল লাগে, তার কারণ, এতে এন্ডরফিনের মতো হরমোন নিঃসৃত হয়। তা ছাড়া, ঘরোয়া কাজে অঙ্গ সঞ্চালন হয়। হালকা কাজ, ফলে করতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু হাত, পা, পেশির ব্যায়ামে রক্ত সঞ্চালন হয়। এন্ডরফিনের মতো হরমোন মনে ভাললাগা, খুশি-তৃপ্তির অনুভূতি তৈরি করে।

হাঁচির সমস্যা নিরসনে বদলান কিছু অভ্যাস

সামান্য ধুলা লাগলেই অনেকের হাঁচি শুরু হয়। এটি খুব সাধারণ একটি সমস্যা হলেও বেশ অস্বস্তিকর। কখনো কখনো তো এত বেশি হাঁচি হয় যে কাজেও ব্যাঘাত ঘটে। মূলত এটি ধুলাবালি অ্যালার্জি, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। আমাদের নাকের ভেতর যখন কোনো বিরক্তিকর উপাদান ঢোকে, তখন শরীর সেই কণা বের করে দিতে চায়। সেই কাজটিই হয় হাঁচির মাধ্যমে। এটি শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তবে কারও শরীর অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হলে একটু ধুলা বা গন্ধেই একটানা হাঁচি শুরু হয়ে যেতে পারে।

ধুলাবালিতে থাকা কিছু অদৃশ্য কণা যেমন- ধূলিকণার অণু, ডাস্ট মাইট (ধুলার ক্ষুদ্র জীবাণু), ছাঁচ বা ফাঙ্গাসের বীজ, পোষা প্রাণীর লোম বা ত্বকের কণা, এসব শরীরের প্রতিরোধব্যবস্থা একধরনের হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে, আর তখনই দেখা দেয় হাঁচি, চোখ চুলকানো কিংবা নাক দিয়ে পানি পড়ার মতো উপসর্গ।

কি করলে মিলবে প্রতিরোধ

ঘর রাখুন ধুলামুক্ত: প্রতিদিন ভেজা কাপড় বা মপ দিয়ে ঘর ঝাড়ু দিন। শুকনো ঝাড়ু দিলে ধুলা আরও ছড়ায়। কার্পেট, পর্দা, চাদর, বালিশ সব নিয়মিত ধুয়ে ফেলুন। বালিশ ও তোশকে অ্যান্টি-অ্যালার্জেন কাভার ব্যবহার করলে ভালো ফল পাবেন।

শরীরে লুকোনো বোতাম টিপলেই হবে 'স্ট্রেস' মুক্তি! সঠিক কৌশল জানলে তবেই হবে কাজ

মানসিক চাপের কারণে বাড়তে থাকে অনিদ্রাজনিত সমস্যা। জানেন কি, শরীরেই লুকিয়ে আছে স্ট্রেস-মুক্ত হওয়ার বোতাম। এর নাম হল ভেগাস স্নায়ু। ভেগাস স্নায়ুকে সক্রিয় করতে পারলেই মানসিক চাপ কমে যাবে। তবে জানতে হবে সঠিক কৌশল।

ঘরে-বাইরে বাড়তে থাকা কাজের চাপ, উদ্বেগজনিত সমস্যা নতুন নয়। সরকারি-বেসরকারি যেমন সংস্থাতেই কাজ করুন না কেন, মানসিক টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় কমবেশি সকলকেই। যার প্রভাব পড়ে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। শারীরিক অন্যান্য জটিলতার মতো মানসিক সমস্যা চোখে দেখা যায় না বলে তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না অনেকে। কিন্তু এই চাপ বাড়তে থাকলে তার প্রভাব পড়ে ব্যক্তিগত জীবনেও। বাড়তে থাকে অনিদ্রাজনিত সমস্যা। জানেন কি, শরীরেই লুকিয়ে আছে স্ট্রেস-মুক্ত হওয়ার বোতাম। এর নাম হল ভেগাস স্নায়ু।

ভেগাস স্নায়ুকে সক্রিয় করতে পারলেই মানসিক চাপ কমে যাবে। তবে জানতে হবে সঠিক কৌশল।

৪-৪-৮ পদ্ধতি: শ্বাসের ব্যায়াম কিন্তু মানসিক চাপ দূর করার সেরা হাতিয়ার হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে শ্বাস নিয়ে আরও ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে হবে। প্রথমে ১, ২, ৩, ৪ গুণে শ্বাস নিন, তার পর ১, ২, ৩, ৪ গুণে শ্বাস ধরে রাখুন। শেষে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ গুণে শ্বাস ছাড়তে থাকুন। এই ব্যায়াম ৫ থেকে ১০ মিনিট করলেই মন অনেকটা শান্ত হবে।

গলার ব্যবহার: গলার সাহায্যেও ভেগাস স্নায়ুকে সক্রিয় করা সম্ভব। এর জন্য গুনগুন করে গান গাইতে পারেন কিংবা কানে আঙুল দিয়ে 'ওঁ' শব্দ বার করুন।

ঠান্ডা ঈানিরব্যবহার: ভেগাস স্নায়ুকে উদ্দীপিত করতে ঠান্ডা পানি দারুণ কাজ করে। এ ক্ষেত্রে কখনও খুব বেশি চিন্তা হলে, মেজাজ হারিয়ে ফেললে মুখে ঠান্ডা ঈানিরঝাপটা দিতে পারেন। এ ছাড়া ফ্রিজ থেকে বরফ বা আইস প্যাক বার করে হাতের উপর কিছু ক্ষণ রাখলেও মন শান্ত হয়, মস্তিষ্ক সঙ্কেত দিয়ে মাথা ঠান্ডা রাখতে বলে। অনেকের মানসিক চাপের কারণে রাতে ঘুম হয় না, সে ক্ষেত্রে রাতে ঘুমোনোর আগে ঠান্ডা জলে স্নান করলে কিন্তু দারুণ উপকার পাওয়া যাবে।





নবজাতকের শরীরে তেল মালিশ করছেন? যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

নবজাতকের শরীরে তেল মালিশের রেওয়াজ বেশ পুরোনো। কিন্তু এখনকার চিকিৎসকেরা তেল মালিশের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তেল মালিশ না করার পরামর্শ দেন। এর বদলে শিশুর শরীরে ময়েশ্চারাইজার মাখানোর পরামর্শ দেন।

তেল মালিশের সময় কী কী সাবধানতা জরুরি?

তেল মালিশের সময় কী কী ভুল করা যাবে না, সেই নিয়ে একটি ভিডিয়ো বানিয়েছেন ভারতীয় চিকিৎসক পবন মান্দাবিয়া। চিকিৎসক বলেন, ''মালিশের শময় শিশুর কানে, নাকে, অম্বালিক্যাল কর্ডে আলাদা করে তেল না দেওয়াই ভালো। এতে ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে। মালিশের সময় শিশুকে হাওয়ায় ভাসানোর মতো ভুল ভুলেও করা যাবে না। এতে ঘাড়ে, মাথায় এবং কোমরে আঘাত লাগার ভয় থাকে। সদ্যোজাত শিশুর মাথায় মালিশের সময় যে গর্ত মতো অংশ থাকে, সেখানে বেশি পরিমাণে তেল দিয়ে রাখবেন না। এতে গর্ত মোটেও ভরে যায় না। মোটামুটি দেড় বছর বয়সে এই গর্ত নিজে থেকেই ভরে যাবে। মালিশের সময় আঙুল দিয়ে নাকের উপরিভাগ তীক্ষ্ণ করার ভুল করবেন না, এতে নসিকাপথের ক্ষতি হয়ে পারে, ভবিষ্যতে শিশুর শ্বাসের সমস্যাও শুরু হতে পারে।''

শিশুরোগ চিকিৎসক অপূর্ব ঘোষও তেল মালিশের বিষয় অভিভাবকদের সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, ''শিশুকে মালিশ করতে হবে আলতো হাতে। এমন অনেক শিশুকে আমি দেখেছি, যাদের মালিশ করার সময় হাড়ে ফ্র্যাকচার হয়ে গিয়েছে। ছোটদের হাড় খুব নরম হয়, তাই সাবধান! খুব ধীরে ধীরে ওদের মালিশ করতে হবে।''

সরিষার তেল নাকি অলিভ অয়েল

সদ্যোজাত শিশুদের তেল মালিশের জন্য সরিষার তেল ব্যবহার না করাই ভালো বলে মনে করেন ভারতীয় চিকিৎসক সন্দীপন ধর। তিনি বলেন, ''সরিষার তেল দিয়ে মালিশের সময় অনেক সময় তেল নাকে ঢুকে যায়। সরিষার তেলের ঝাঁজে শিশুদের কষ্ট ও অস্বস্তি হতে পারে। তা ছাড়া এখন নির্ভেজাল সরিষার তেল প্রমাণ করার জন্য তেল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি বিভিন্ন ধরনের ঝাঁঝালো উপাদান ব্যবহার করে। সেই উপাদানগুলির জন্য শিশুর ত্বক জ্বালা করে, র‍্যাশও বেরোয়। এ ছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, সরিষার তেলে অ্যালিল আইসো থায়োসায়ানাইট যৌগ থাকে, এই যৌগটি শিশুর ত্বকের জন্য মোটেও ভালো নয়। সরিষার তেলের বদলে শিশুর তেল মালিশের জন্য সবচেয়ে ভালো বিকল্প হতে পারে নারকেল তেল কিংবা অলিভ অয়েল।''



রোদ মাখুন, সুস্থ থাকুন

চিকিৎসা সাময়িকী ডেস্ক

পুরোনো কথাটাই নতুন করে বলি, সকালে পরিমিত পরিমাণ দেহে রোদ লাগানো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। যারা সানক্রিন ব্যবহার না করে বেশিক্ষণ রোদে থাকেন তাদের ক্যানসারসহ নানা রোগ হতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ রোদ আপনার দেহঘড়ি, মন মেজাজ সর্বোপরি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

আসুন জেনে নিই যে কারণে আপনার সকালের রোদে থাকা উচিত:

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের মতে, যদি কেউ সকালে একঘণ্টা রোদে থাকেন, তার ভালো ঘুম হওয়া নিশ্চিত।

আবার খুব সকালের জানালার মধ্য দিয়ে আসা মিষ্টি রোদ দেহের জন্য যেমন উপকারী তেমনি সকাল সকাল ঘুম ভাঙাতেও সাহায্য করে থাকে।

সকালের রোদ গায়ে মাখলে যে শুধু প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায় তা কিন্তু নয়, এতে আপনার ওজনও কমবে। যারা দিনের অন্য সময়ের তুলনায় সকালের উজ্জ্বল আলোর সংস্পর্শে বেশি সময় থাকেন, তাদের ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। মনোবিদদের মতে, যেসব মানুষ প্রাকৃতিক আলোতে বেশি সময় কাটান তাদের বিষণ্নতায় ভোগার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। এটাই নাকি হতাশা কাটানোর সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা।

সকালের রোদ দেহের সংস্পর্শে আসলে দেহে ভিটামিন ডি সৃষ্টি হয়। এই 'সানসাইন ভিটামিন' ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে যা হাড়ের জন্য উপকারী। এছাড়া স্যালমনের মতো নানা সামুদ্রিক মাছেও ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়।

কোনো কোনো গবেষণায় দেখা গেছে, সানসাইন ভিটামিন ব্রেস্ট, প্রস্টেট ক্যানসার এবং হৃদরোগসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

বোস্টন ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক মাইকেল হলিক বলেন, অত্যাবশ্যকীয় হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেহে উল্লেখযোগ্যহারে ভিটামিন 'ডি' এর ঘাটতি রয়েছে। তার মতে, সূর্যের আলোর ভিটামিন দিয়ে আমাদের দেহের ছয়ভাগের একভাগ জিনোমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী বহু লোক ভিটামিন 'ডি'র অভাবে ভুগছে। তাছাড়া ভালো ত্বকের জন্য দৈনিক ১৫ মিনিট রোদে পোড়া ভালো।

অতিরিক্ত বিশ্রাম থেকেও হতে পারে মাইগ্রেন

চিকিৎসা সাময়িকী ডেস্ক

মাইগ্রেনকে অনেকেই সাধারণ মাথাব্যথা ভেবে হালকাভাবে নেন। কিন্তু যারা ভুগেছেন তারাই জানেন এর যন্ত্রণা কতটা অসহনীয়। মাথার এক পাশে ধকধকে ব্যথা, বমি বমি ভাব, আলো শব্দের প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীলতালবএসবই মাইগ্রেনের বৈশিষ্ট্য। সাধারণত মানসিক চাপ, কাজের ক্লান্তি কিংবা ঘুমের অনিয়মকে এই ব্যথার জন্য দায়ী ধরা হয়। তবে জানলে অবাক হবেন, কখনও কখনও অতিরিক্ত বিশ্রামও মাইগ্রেনের কারণ হতে পারে।

চিকিৎসকরা এখনো নিশ্চিত নন, আসলে কোন একক কারণে মাইগ্রেনের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে মানসিক চাপ, কাজের চাপ, ঘুমের অনিয়ম, নির্দিষ্ট কিছু খাবার বা পানীয় সবই ভূমিকা রাখতে পারে। সাধারণত কাজের চাপ থেকে মুক্তি পেতে ডাক্তাররা রোগীকে বিশ্রামের পরামর্শ দেন। আলোশব্দ এড়িয়ে আরাম করলে ব্যথা কিছুটা কমেও আসে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, কখনও কখনও



এই বিশ্রামই মাইগ্রেনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন লম্বা ছুটি বা হঠাৎ করে অনেকটা আরাম পেলে কিছু মানুষের মাইগ্রেন দেখা দিতে পারে।

বিশ্রাম নিজে থেকে ক্ষতিকর নয়। বরং সমস্যা তৈরি করে মকঅতিরিক্ত বা হঠাৎ রুটিনের পরিবর্তন। শরীর ও মস্তিষ্ক কাজের চাপে যখন অভ্যস্ত থাকে, তখন হঠাৎ করে দীর্ঘ বিশ্রাম নিলে তারা যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলে। এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনই মাইগ্রেনকে উসকে দিতে পারে।

এ কারণেই টানা ব্যস্ততা শেষে হুট করে আরামের ছুটিতে গেলে অনেক সময় মাথাব্যথা শুরু হয়। তবে এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটে না। যাদের নিয়মিত মাইগ্রেনের সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই কারণ তুলনামূলক কম প্রভাব ফেলে।

বিশ্রাম একেবারেই বন্ধ করার দরকার নেই। বরং কাজের ফাঁকে ছোট ছোট বিরতি নিন, যাতে শরীর ও মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বিশ্রামের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। হুট করে সব চাপ ছেড়ে দিলে শরীর বিভ্রান্ত হতে পারে, আর সেখান থেকেই মাথাব্যথা শুরু হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তবে মনে রাখবেন, মাইগ্রেনের প্রধান কারণ সাধারণত মানসিক চাপ, অনিয়মিত ঘুম, ক্যাফেইন বা অ্যালকোহল সেবন। তাই আরাম কিংবা ছুটি উপভোগ করার সময় এসব বিষয়ে সচেতন থাকলে মাইগ্রেনের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাবে।

যেসব ভুলে কমছে না পেটের চর্বি



চিকিৎসা সাময়িকী ডেস্ক

শরীরের ওজন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে, বিশেষ করে পেটে চর্বি জমলে তা হৃদরোগ ও টাইপ টু ডায়াবেটিসসহ নানা শারীরিক জটিলতার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

এ বিষয়টি অনেকেরই জানা। তারপরেও অনেকেরই পেটে জমে যায় মাত্রাতিরিক্ত চর্বি। এটি কমানোর জন্য অনেকেই ব্যায়াম থেকে শুরু করে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে আনা পর্যন্ত অনেক ধরনের কাজই করেও কোনো সুফল পাননি।

এর কারণ হিসেবে থাকতে পারে ভুল ডায়েটিং কিংবা ভুল শারীরিক অনুশীলনের মতো বিষয়। আজকের লেখায় থাকছে তেমনই কয়েকটি বিষয়, যা আপনার পেটের চর্বি কমানোর চেষ্টা ভণ্ডুল করে দেয়।

* বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেহের নানা মাপকাঠি পরিবর্তিত হয় এবং এতে ওজনও বাড়তে পারে। এক্ষেত্রে পুরুষ বা নারী, উভয়েরই দেহের ওজন বাড়তে পারে।

* মধ্যবয়সী নারীদের মেনোপজের জন্য পেটে বাড়তি চর্বি হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তবে ভালো খবর হলো, চিকিৎসকের সহায়তায় এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যায়।

* অনেকেই বড় কোনো ব্যায়াম প্রোগ্রামের একাংশের ব্যায়াম করে থাকেন। কিন্তু আপনি যদি শুধু হৃৎপিণ্ডের জন্য ব্যায়াম করেন তাহলে তা পেটের চর্বি কমাতে ভূমিকা রাখবে না।

এজন্য সঠিক ব্যায়াম করতে হবে। পেটের চর্বি কমানোর জন্য প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ২৫০ মিনিট মাঝারি মাত্রার ব্যায়াম বা ১২৫ মিনিট উচ্চমাত্রার নির্দিষ্ট ব্যায়াম করা যেতে পারে।

* আপনার কি অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে? ক্র্যাকার্স, চিপস, পরিশোধিত চিনি, কোমল পানীয়, মিষ্টি খাবার ইত্যাদি আপনার পেটের চর্বি বাড়িয়ে দেয়। এর বদলে প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া খাবার যেমন ফলমূল, সবজি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ অন্যান্য খাবার আপনার পেটে চর্বি জমা থেকে রক্ষা করবে।

* মানবদেহ সব ধরনের চর্বিতে একই আচরণ করে না।

গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চমাত্রায় দ্রবীভূত চর্বি (মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের চর্বি) গ্রহণ পেটের চর্বি বাড়িয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে কিছু উদ্ভিদ, মাছ, সূর্যমুখী তেল ও অলিভ অয়েলে থাকা অদ্রবীভূত চর্বি ক্ষতিকর নয়। বরং সঠিকভাবে খেলে পেটের চর্বি নিয়ন্ত্রণেও এগুলো ভূমিকা রাখে। অবশ্য মাত্রাতিরিক্ত যেকোনো খাবার খাওয়াই ক্ষতিকর হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

* পেটের চর্বি কমানোর জন্য অনেকেই অল্পমাত্রায় শারীরিক অনুশীলন করেন। কিন্তু কিছুদিন অনুশীলনের পর কোনো উপকার পান না। এর কারণ হতে পারে অপর্যাপ্ত অনুশীলন। তাই শারীরিক অনুশীলনের মাধ্যমে পেটের চর্বি কমানোর জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। অন্যথায় কোনো পরিবর্তন নাও হতে পারে।

* আপনার পেটের চর্বি কমানোর সামান্য লক্ষণ দেখা গেলেই কি অনুশীলন বাদ দেন? ব্যায়াম পুরোপুরি সফল হওয়ার আগেই যদি আপনি অনুশীলন ছেড়ে দেন তাহলে এর ফলাফল ধরে রাখা সম্ভব হবে না। এ ছাড়া রয়েছে শুধু পেটের অনুশীলনের মতো কাজ করা। এক্ষেত্রে সারা দেহের জন্য সুষম অনুশীলন করা হতে পারে সঠিক উপায়।

* আপনার যদি কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা, সন্তান ইত্যাদি নিয়ে অতিরিক্ত চাপের মাঝে থাকতে হয় তাহলে তা পেটের চর্বি বাড়াতে ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে অন্যান্য উপায় প্রয়োগ করার আগে মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করুন।

* আপনার যদি পর্যাপ্ত ঘুম না হয় তাহলে তা দেহের ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে। এর অন্যতম রূপ হতে পারে পেটের চর্বি বৃদ্ধি। এজন্য ব্যক্তিভেদে প্রতি রাতে সাত থেকে ৯ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমানোর প্রয়োজন হয়।

* অনেকের দেহের মাঝখানের অংশ বিশেষ করে পেট, থাই, উরু ইত্যাদি গঠনগত কারণেই মোটা থাকে। জেনেটিক কারণেই এমনটা হতে পারে। এ ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পেটের চর্বি কমানো কঠিন; তবে অসম্ভব নয়। এজন্য বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়।

* টেস্টোস্টেরোনের মাত্রার ওপর দেহের অনেক বিষয় নির্ভর করে। এ হরমোনটি দেহে উচ্চমাত্রায় থাকলে তা ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওজন কমানোর চেষ্টা করতে হবে।

* পেটের চর্বি কমানোর ক্ষেত্রে উৎসাহের সঙ্গে অনুশীলন করার কোনো বিকল্প নেই। আপনি যদি পেটের চর্বি কমাতে চান আবার সব উপায়গুলো ঠিকঠাক মেনে না চলেন তাহলে তা কোনো উপকারে আসবে না।

নিউ লাইফ হসপিটাল লিঃ

আমাদের সেবা সমূহ

- বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চেম্বার
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ (ইমাজেন্সি)
- ২৪ ঘন্টা প্যাথলজী ল্যাব
- ২৪ ঘন্টা অপারেশনের সু-ব্যবস্থা
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী
- ২৪ ঘন্টা এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
- ডিজিটাল এক্স-রে সিটি স্ক্যান
- আল্ট্রাসনোগ্রাফি ডুপ্লেক্স স্টাডি
- 4D কালার ডপলার
- কোলনোস্কপি
- ই আর সিপি
- এন্ডোসকপি
- ডায়ালাইসিস
- আই সি ইউ
- নিউরো মাইক্রোস্কোপিক অপারেশন
- মেডিসিন, নিউরো মেডিসিন, নেফ্রোলজী
- C-Arm স্পাইন অপারেশন
- স্পেশালাইজড নিউরো অপারেশন থিয়েটার
- স্পেশালাইজড অর্থোপেডিক অপারেশন থিয়েটার
- ফিজিওথেরাপী সেন্টার
- ডায়াবেটিস সেন্টার
- আর্থোস্কপিক সার্জারী
- ডেন্টাল সেন্টার
- ফিজিওথেরাপী সেন্টার
- ডায়াবেটিস সেন্টার
- ই এন টি সেন্টার
- হেমাটোলজি সেন্টার
- গাইনি এন্ড ইনফার্টিলিটি সেটার



ঠিকানা : ২৫/এ, বীর উত্তম কে.এম. শফিউল্লাহ সড়ক (গ্রীন রোড), ঢাকা-১২০৫
মোবাইল: ০১৮৭৩-৯৬৬১৮৮, ফোন: ০২৪৪৬১১৫৭০-৩



First choice for sensitive teeth



Mediplus

TOOTHPASTE, TOOTHBRUSH & DENTALFLOSS